উৎস মানুষ

৩২ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
তারা-খসা	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
এক মার্কিন চাষীর কাহিনী	সমর বাগচী	৩
তুলসী মুকুল	রঞ্জন ঘোষ	৪
ধান-সংস্কৃতি	অনুপম পাল	৬
পিঙ্কি বিতর্ক	শাশ্বতী ঘোষ	১৫
রুশদি ও নতুন ধর্মতন্ত্র	প্রবীণ স্বামী	১৭
এ পরবাসে রবে কে	মোহিত রণদীপ	১৯
মোবাইল প্রশ্ন		২১
মোবাইল ফোন: যা রটে	ভূপতি চক্রবর্তী	২২
ভীড়ে ভিড়বেন না	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৪
বনবিহারীর ধর্মভাবনা	সমীরকুমার ঘোষ	২৬
আধুনিক ভারতের তীর্থক্ষেত্র	নিরঞ্জন বিশ্বাস	২৯
সংগঠন সংবাদ		৩০
প্রকৃতিকে ওঁরাই চেনেন ভাল		৩১
গ্রন্থ সমালোচনা		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

সুখের কথা, 'আবহাওয়া সংখ্যা'টি পাঠক-সমাদৃত হয়েছে। অনেকেই ফোন করে, ই-মেল পাঠিয়ে প্রশংসা করেছেন। গত সংখ্যা প্রকাশের পর পরই এপ্রিল মাসে 'জলবায়ুর পরিবর্তন : আমরা কেন আতঙ্কিত? আমাদের প্রস্তুতির পথ কী?' এই শিরোনামে এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল ইনস্টিটিউট অভ ইঞ্জিনিয়ার্সের আর এন মুখার্জি হলে। উদ্‌যোগ ছিল দিল্লির লিবার্টি ইনস্টিটিউটের, এর সহযোগী ছিলাম আমরাও। আশীষ লাহিড়ীর সঞ্চালনায় দারুণ উপভোগ্য আলোচনা হয়। মোহিত রায়, সুজয় বসু, বরুণ মিত্র, অঞ্জন সেনশর্মা, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, গৌতম সেন, গোকুল দেবনাথ, মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধজনেরা সবিস্তার জানান সমস্যার কথা, সমাধান ও সচেতনতা বিষয়ে অবহিতও করেন। এই জাতীয় আলোচনা বিভিন্ন জায়গায় হওয়া দরকার।

অ্যাথলেট পিঙ্কি প্রামাণিক এখন প্রতিদিনের সংবাদে মুচমুচে খবর। তিনি কোথায় কতটা পুরুষ তার বিস্তারিত গবেষণা বাসে-ট্রামে, চায়ের দোকানে। তথ্য জোগান দিচ্ছে সংবাদপত্রগুলো। পরীক্ষার নামে তাঁকে ফোকটে টিপেটাপে দেখার সুযোগ কেউ ছাড়ছে না। তার ভিডিও-ও এখন অনেকের মোবাইল ফোনে। ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দল। পিঙ্কি যে তিমিরে সেই তিমিরে। নজরুল লিখেছিলেন, 'গরিবের বৌ বৌদি সবার, বলে নে বাপ নেই বাধা।' পিঙ্কি গরিবের মেয়ে। তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করার হক তো আমাদের আছেই। অভিযোগ প্রমাণের আগেই চাকরি থেকে সাসপেন্ড। প্রমাণ হলে চাকরি তো যাবেই হয়ত, এতদিনের চাকরির বেতনও ফেরত চাইবে! ন্যায়বিচার ও আমাদের বিবেক জাগ্রত হয় হিন্দি ছবির পুলিসের মতো। সমস্ত ঘটনার ইতি হওয়ার পর শুরু হয় তাদের কাজ। বেচারা পিঙ্কি! (এটুকু লেখা শুধু পিঙ্কির প্রতি আমাদের অমানবিক আচরণে। তাঁর অপরাধ যদি সত্যিই হয়, তাকে সমর্থন করার জন্য নয়।)

এক সুখের কথা দিয়ে লেখা শুরু হয়েছিল, এক দুঃখের কথা দিয়ে শেষ করি। ইউনিয়ন কার্বাইডের কর্তা বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন। মার্কিন আদালত ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে বেরনো গ্যাসে শয়ে শয়ে লোকের মৃত্যুর জন্য মহান শিল্পপতিটিকে দোষী ঠাওরায় নি। বিচারের এই বাণীতে আমরা দুঃখ পেলেও উল্লসিত হবেন সেইসব মহান শিল্পোদ্যোগীরা, যাঁরা এমন প্রাণঘাতী রাসায়নিক নিয়ে ব্যবসা করেন। বহুজাতিক এইসব সংস্থাই তো এখন সবকিছুর নিয়ন্তা। তাই বলতে হবে—হুজুর মা বাপ!

আহরণ

তারা-খসা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষ্কার রাতের নিকষ কালো আকাশের বুকে অজস্র অগুন্তি আলোর চুমকির মত তারার মেলা—কার না মন কেড়ে নেয়। কেমন যেন উদাস আত্মমগ্ন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ছেলেবেলায় আমার এই নিরীহ সুখটুকু কেড়ে নিয়েছিলো আমার ঠাকুমা—রাতের আকাশ দেখা আমাদের ভাইবোনদের বারণ ছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে সেই রহস্যময় তারা রাজ্যে তৃষ্ণার্ত চোখ মেলতে গিয়ে ধরাও পড়েছি—মারও খেয়েছি।

ঠাকুমার সেই সস্নেহ খবরদারির কারণ ছিল 'তারা-খসা'। রাতের আকাশে তারা খসে যায় হঠাৎ হঠাৎ; সেটা চোখে পড়লেই অমঙ্গল—সাংঘাতিক কিছু নাকি ঘটে যেতে পারে নিজের বা পরিবারের কারুর। অতএব সাবধানতা। ঠাকুমা তাই বলতো। সবাই বলতো। এখনও বলে অনেকেই। ...এই 'তারা-খসা'র ব্যাপারটা বোধহয় সকলেরই চেনা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কমবেশী চোখে পড়ে রোজই। আঁধারের বুক চিরে একটা ক্ষুদে আলোর বিন্দু দ্রুত ছুটে গেল কিছুটা, তারপরই টুপ করে নিভে গেল বা তারার ভিড়ে হারিয়ে গেল আচম্‌কা। এরই নাম 'তারা-খসা'।

কিন্তু তারা আবার খসে নাকি? আকাশটা কি তারা-ধরে-রাখা কোন চাদর যে তার গা থেকে গ্রহ-তারারা যখন তখন টুকটাক করে খসে পড়ে যাবে? পৃথিবীর বাইরেকার অনন্ত জগৎটাতে তারাদের অবস্থানের চিত্রটা মানুষ এখন জেনে গেছে বিজ্ঞানের দৌলতে। বিশাল বিপুল মহাবিশ্বে আমাদের এই গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রজগৎ, বাইরের নক্ষত্রজগৎ, নীহারিকা ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুগুলির দূরত্ব, অবস্থান, গতিবেগ—এরকম সব খবরাখবর নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে শুরু করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই। শ্যাপলি, হাব্‌ল্‌, হয়েল-এর মত বিজ্ঞানীরা চোখে দূরবীন এঁটে, উন্নততর গণিত ব্যবহার করে, আর ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে যাচাই করে করে আকাশের রহস্যকে একের পর এক উন্মোচন করেছেন। এত কিছু তথ্য-তত্ত্বের ভরসায় আজ আমরা বলতে পারি, আকাশের তারারা এক নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল মহাকর্ষীয় নিয়ম মেনে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর ধরে নিজেদের জগৎ রচনা করে আছে; সেই নিয়ম এতই সুশৃঙ্খল, জ্যোতিষ্কদের বাঁধন এতই দৃঢ় যে মহাকাশের বুকে যখন-তখন জ্যোতিষ্ক বা তারা ছিটকে গিয়ে 'তারা-খসা' ঘটিয়ে দেওয়া অসম্ভব। হ্যাঁ, একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষা যতটুকু এসেছে তার দৌলতেই তারা-খসার ভ্রান্তিকে এখন চিনে নেওয়া যায়।

এটা স্বাভাবিক যে, একপুরুষ আগেও এতটা জানা ছিল না। অজ্ঞতাই কুসংস্কার আর বিভ্রান্তি টিকিয়ে রাখে। প্রাকৃতিক ঘটনা যতদিন রহস্যাবৃত থাকে ততদিন নানাবিধ অযৌক্তিক বিশ্বাস আর অবাস্তব শঙ্কা তার সঙ্গে মিশে থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই আমার ঠাকুমা কিংবা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ আকাশের ওই আলোকবিন্দু ছুটে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে 'তারা খসে যাওয়া' বলে ধরে নিয়েছেন এবং অমঙ্গল বা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থেকেছেন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই।

কিন্তু 'তারা-খসা' আর সে সম্পর্কে লোকবিশ্বাস ভিত্তিহীন হলেও আকাশের বুকে আলোকবিন্দু ছুটে যাওয়ার ঘটনা তো মিথ্যে নয়, সেটা তো বাস্তব অভিজ্ঞতাই। তার ব্যাখ্যা কী? ওটা আসলে উল্কাপাত, একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। উল্কা হল পাথরের খণ্ড, মহাজাগতিক পাথর। অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে এরা এই সৌরমণ্ডলে—পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের চারপাশে—মহাশূন্যের আনাচে-কানাচে। সংখ্যায় অগুনতি, সাইজেও তেমনি; সামান্য কয়েক গ্রাম থেকে শুরু করে বেশ কয়েক টন ওজনের উল্কাপিণ্ড রয়েছে মহাকাশে। অনর্গল ছুটে বেড়ানোর তালে যদি কোন উল্কাখণ্ড হঠাৎ পৃথিবীর টানের (মাধ্যাকর্ষণ) মধ্যে এসে যায় তাহলে সেটা দুরন্ত গতিতে ঢুকে পড়ে আমাদের বায়ুমণ্ডলে আর নামতে থাকে মাটির দিকে। যত নামে তত বাড়ে টান, তত বাড়ে গতি। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের প্রবল ঘর্ষণে তপ্ত হতে হতে একসময় জ্বলে ওঠে সেটা। আর সেই জ্বলন্ত উল্কাকেই নিকষ আকাশের বুকে ছুটন্ত আগুন-ফুলকি বা 'খসে যাওয়া তারা' বলে মনে হয়। মাত্র এক-দু সেকেন্ডেই উল্কার দৌড় শেষ হয়। অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কদাচিৎ দু একটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে; বিজ্ঞানীরা সেগুলোর ওপর পরীক্ষা চালান। আমেরিকার আরিজোনা স্টেট-এর উইন্‌স্‌লো অঞ্চলে যে এক মাইল চওড়া আর ৬০০ ফুট গভীর গর্তটা পর্যটকরা দেখতে যান সেটা মস্ত বড় এক উল্কার আঘাতে তৈরি হয়েছে; এরকম ছোট-বড় উল্কা-গহ্বর রয়েছে পৃথিবীর বুকে অসংখ্য। এগুলোই উল্কা-তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ। অতদূর যেতে হবে না, ইন্ডিয়ান-মিউজিয়ামে ভূবিদ্যার ঘরে কাঁচের কাসকেডে সাজানো রয়েছে নানা মাপের কয়েকটি উল্কাপিণ্ড। বায়ুমণ্ডলে পুরোপুরি

জ্বলে ছাই হয় নি এগুলো; মাটিতে আছড়ে পড়ার পর সংগ্রহ করা গেছে।

কাজেই 'তারা-খসা' নয়, উল্কা-পড়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হল বিজ্ঞানের এই উদ্ঘাটিত সত্যকে দীর্ঘকাল ধরে অস্বীকার করেছে মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণায় আচ্ছন্ন সমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতরা (বলতে গেলে যাঁরা সেই শতাব্দীতে আকাশীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় প্রায় 'পেটেন্ট' নিয়ে ফেলেছিলেন) রীতিমত একগুঁয়ের মতো এ ব্যাপারে মধ্যযুগীয় ধারণাকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। সে সময় কোন লোক 'উল্কাপাত দেখেছি' বলে দাবি করলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলে প্রচার করা হত। কেউ আকাশ থেকে পড়া উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করে নিয়ে এলে বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্বিচারে মত দিতেন যে ওটা অন্য কোন দূরবর্তী জায়গার পাথরের টুকরো---ঝড়-ঝাপটায় উড়ে এসে পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞান পত্রিকা Academiedes Sciences উল্কাপাত মতবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। এরকম অবৈজ্ঞানিক হাওয়া চলেছিল বহুকাল, প্রায় শ'খানেক বছর ধরে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল, যেদিন ফ্রান্সের লাইগল্ শহরে কয়েক হাজার ক্ষুদে ক্ষুদে উল্কার টুকরো বৃষ্টির মত ঝরে পড়েছিল, সেদিন থেকেই তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদেরা পৃথিবীর বাইরে থেকে পাথরখণ্ড বা উল্কার পতনের সত্যতা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেন।

অর্থাৎ একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে তার ন্যায্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল গোটা একটা শতাব্দী—প্রচলিত বিশ্বাসের শিকড়ের এতটাই জোর!

অন্বেষা: প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৮৩

এক মার্কিন চাষির কাহিনী

সমর বাগচী

প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আর সেই শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের সামান্য ঘাসের মাধ্যমেও দিতে পারে। আধুনিক কৃষিব্যবস্থার নামে আমরা যেভাবে মাটির সর্বনাশ করে চলেছি, তা রোখার দিশা দেখাতে পারে আপাততুচ্ছ তৃণভূমিই। উত্তর আমেরিকার এক বাস্তুতন্ত্র বিজ্ঞানী (ইকলজিস্ট) ডঃ ওয়েন জ্যাকসনের এমন দাবিতে নড়েচড়ে বসেছেন কৃষিবিজ্ঞানীরা। অদ্ভুত মানুষ এই জ্যাকসন। তিনি প্রকৃতির প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে কাজ শুরু করেছেন। তাঁর গবেষণা সফল হলে আমূল বদলে যাবে কৃষি-ভাবনা। জ্যাকসন এতটাই প্রকৃতিবাদী যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আজকের আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক চাষ ব্যবস্থা এক অমিতব্যয়ী ভুল। তিনি তাঁর শিক্ষক হিসেবে তৃণভূমিকে বেছে নিয়েছিলেন। আর এর বাস্তুজ্ঞান থেকে এক স্বয়ম্ভর, উচ্চ ফলনশীল চাষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন যা মাটি, জল, জ্বালানি এবং জীববৈচিত্র আধুনিক রাসায়নিক চাষ ব্যবস্থার বিপরীত। জ্যাকসন বলেন, 'আমরা প্রজাতি হিসাবে শোষণ করাটাকেই জীবনপ্রণালী হিসেবে বেছে নিই।' জ্যাকসনকে আমেরিকার প্রগতিশীল চাষীদের একজন বলে ধরা হয়। তিনি বলেন, 'তৃণভূমির দিকে তাকিয়ে দেখো। তা সূর্যালোকের ওপর নির্ভর করে এবং প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রীকে ক্রমাগত পুনর্ব্যবহার করে চলে। ঐ বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করে চলেছে। তার যে নিয়ম তা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য!'

জ্যাকসন ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠান The Land Institute স্থাপন করেন যেখান থেকে তিনি তাঁর ১০০ একরের লম্বা লম্বা তৃণভূমিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ঐ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল মধ্য ক্যানসাসের স্মোকি হিল রিভারের গা ঘেঁষে। ১৯৮০-র দশক থেকে জ্যাকসন একদল বিজ্ঞানীকে নিয়ে 'গৃহপালিত তৃণভূমি' (domestic prairie) সৃষ্টির স্বপ্নে মগ্ন। ঐ গৃহপালিত তৃণভূমি ব্যবহার করে চাষ না করা তৃণভূমির সঙ্গে প্রচলিত উচ্চফলনশীল চাষ ব্যবস্থাকে যোগ করে এক নূতন প্রথা উদ্ভাবন করছেন জ্যাকসনরা।

ঐ ল্যান্ড ইনস্টিটিউট আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার কে প্রস্তাব দিয়েছে যে তারা তাদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকায় যে ২৬টি প্ল্যান্ট মেটেরিয়াল সেন্টার আছে সেখানে তাঁরা তাঁদের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চান। তাঁরা আরও প্রস্তাব দেন যে দেশের ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ একর বন্ধ্যা জমিতে ১০০ বছরের পুরনো কনজারভেশন রিজার্ভ প্রোগ্রাম-এ দেশজ ঘাস রোপণের যে প্রকল্প চলছে তার সঙ্গে তাঁদের উদ্ভূত নতুন চাষ ব্যবস্থার এক তুলনামূলক গবেষণা করতেও চান। জ্যাকসন এবং তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার প্রয়োজন আছে। প্রথাগত কৃষিবিজ্ঞানীরা জ্যাকসনের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। নেবাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাস্টেইনেবেল এগ্রিকালচারাল সিস্টেমস্-এর অধ্যক্ষ চার্লস ফ্রান্সিস বলেন যে The Land Institute প্রায় অবিশ্বাস্য বিষয়কে প্রয়োগ করেছে।

ল্যান্ড ইনস্টিটিউট-এর রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে গত ১০০ বছরেরও বেশি যে চাষ প্রথা প্রচলিত আছে তাতে উত্তর আমেরিকার তৃণভূমির প্রায় অর্দ্ধেক জমির উপরিস্তরের মাটিকে ক্ষয় করেছে। প্রতি বছরে আমেরিকার প্রায় ৩০০ কোটি টনেরও বেশি মাটি ক্ষয়ে গিয়ে নদী ও বাঁধে জমছে। যে ৪০ কোটি একর চাষযোগ্য জমি আছে তার ৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমি ক্ষয়প্রবণ। এছাড়া আধুনিক চাষে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার

করা হয়। খাদ্য উৎপাদন করতে যে শক্তি ব্যবহার করতে হয় তার সঙ্গে খাদ্যের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাদের অনুপাত ১০:১। এছাড়াও যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক বিষ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ বিরাটভাবে দূষিত হচ্ছে। তৃণভূমির মডেলে ডঃ জ্যাকসনের যে চাষ ব্যবস্থা তাতে জমির মাটিকে সংরক্ষণ করে নতুন, খুবই উর্বর মাটি সৃষ্টি হয়। এই চাষ ঘটবে সূর্যের আলোর শক্তি থেকে যেমনভাবে উদ্ভিদ শক্তি সঞ্চয় করে। তেল বা গ্যাস নয়। নিজের উর্বরতা নিজেই সৃষ্টি করে। এই চাষ মনুষ্যসৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে না। কীট এবং রোগকে প্রতিহত করতে উদ্ভিদের নিজের যে বৈচিত্র এবং অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাকে ব্যবহার করে।

'গৃহপালিত তৃণভূমি'র যে মডেল যেখানে প্রতি বছরে একবার বা কয়েকবার ফসল উৎপাদিত হবে। কিন্তু ৫ থেকে ১০ বছরে আবার নতুনভাবে রোপণ করতে হবে। ল্যান্ড ইনস্টিটিউট প্রকৃতি থেকে এবং প্ল্যান্ট মেটেরিয়াল সেন্টারস থেকে কয়েক হাজার কোমল বীরুৎ (herbacious) জাতীয় দীর্ঘজীবী শীতকালীন কষ্টসহিষ্ণু উদ্ভিদ সংগ্রহ করল। চারটি সাফল্যমণ্ডিত উদ্ভিদগুলি হল: পূর্বদেশের গামা ঘাস যা ভুট্টার এক গরমকালের সদস্য, বিরাটাকার বন্য ধান যা শীতকালীন এক গম, Illinois-এর bundle flower যা হল একরকমের সিমজাতীয় শস্য এবং Maximillian সূর্যমুখী। একটি মিউটেশনগ্রস্ত (mutant) পূর্বদেশের গামা ঘাসকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঐ ঘাসের সবলতা না হারিয়ে নিজের দ্বিগুণ বা চারগুণ বীজ সৃষ্টি করতে পারে। এইসব পরীক্ষা চ্যালেঞ্জ করে সেইসব ধারণাকে যা বলে যে বীজের উৎপাদন ও শিকড়ের বেড়ে ওঠার মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। ইনস্টিটিউট-এর পরীক্ষা এও দেখিয়েছে যে যখন একরূপী (monoculture) চাষের পরিবর্তে বহুরূপী (polyculture) চাষ করা যায় তখন কীট এবং রোগের প্রভাবও অনেক কমে যায়।

১৯৯১ সালে ল্যান্ড ইনস্টিটিউট স্থাপন করে Sunshine Farm। সেটি ছিল বাস্তুতন্ত্র সম্মত শস্যখামার যেখানে নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং জৈবচাষ করা হয়। এই খামারের উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা হয় 'গৃহপালিত তৃণভূমি'র। এটি ১০ বছরের প্রজেক্ট। সেখানে ব্যবহার করা হয় ঘোড়া এবং ট্রাক্টর—যা চলে খামারে উৎপাদিত উদ্ভিজ্জ তেলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা দেখা যে একটি প্রচলিত খামারের শস্য উৎপাদনে কতখানি নিজস্ব উৎপাদিত শক্তি এবং উর্বরাশক্তি জোগান দেওয়া যায়। ল্যান্ড ইনস্টিটিউট দক্ষিণপূর্ব ক্যানসাস-এ মাত্র ৫০ জন বসবাস করে Matfield green নামে এক ছোট্ট শহরে দোকান খুলেছে। জ্যাকসন তাঁর সাম্প্রতিক বই-এ লিখেছেন যে আমেরিকার Great Plains-এর যে হাজার হাজার ছোট ছোট মৃতপ্রায় শহরে আছে তাকে আবার সজীব করা প্রয়োজন। তা শুধু অতীত-আর্তির জন্য নয়। প্রয়োজন তৃণমূল স্তরে সামাজিক এবং বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য।

প্রবন্ধটি আমেরিকান 'Science Update' থেকে গৃহীত। **উমা**

তুলসী মুকুল

রঞ্জন ঘোষ

কত ধানে কত চাল হয় এটা সেয়ানা লোকেরা বলতে পারে। কিন্তু কত রকমের ধান হতে পারে—এ প্রশ্নের জবাব মেলা মুস্কিল। জবাব পাওয়া গেল 'কলকাতা বীজ উৎসবে'।

বিশেষজ্ঞরা জানালেন স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় ৪০,০০০ রকমের বিভিন্ন প্রজাতির ধানের চাষ হত। তাদের কেউ কুচকুচে কালো, কেউ শাঁখের মতো সাদা, কারুর রঙ সিঁদুর লাল, কেউ বা কাঁচা সোনার বরণ। কেউ জিরের মতো সরু, কেউ চীনে বাদামের দানার মতো মোটা। কারুর জন্ম এক গলা নোনা জলের মধ্যে, কেউ বা শুকনো ডাঙার বাসিন্দা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের প্রয়োজন, বিভিন্ন ধার্মিক, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এবং স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছিল এই বিভিন্ন প্রজাতিগুলি। খই বানাবার জন্য অতিরিক্ত স্টার্চযুক্ত 'বিন্নি' ধান, চিঁড়ের জন্য 'কার্তিক শাল' কিংবা 'লক্ষণ শাল'। ইডলি ধোসা বানাবার জন্য এক রকমের ধান আবার পান্তা ভাত বা 'পখাল' বানাবার জন্য উড়িষ্যার চাষীরা তৈরি করেছেন আর এক রকম ধান। রাজা বাদশাদের পায়েস-পোলাও-এর জন্য সরু সুগন্ধি ধান, আবার মুটে মজুরদের জন্য মোটা চাল যা খেলে অনেকক্ষণ খিদে পাবে না। দেবতার নৈবেদ্যর জন্য এমন ধান যার চাল বিনা সেদ্ধ করেই খাওয়া যায়, আবার সাধু সন্ন্যাসী যাঁরা দিনান্তে একবার অন্নগ্রহণ করেন তাঁদের জন্য এমন ধান যার চালে কিছু মাত্রায় প্রোটিন আছে—ফলে বেশি পুষ্টিকারক।

সাধারণ মুর্খ চাষারা হাজার বছরের অনলস পরিশ্রমে তৈরি করেছিল এই বিশাল বৈচিত্র্যময় ধান্য বীজের ভাণ্ডার; আর সমাজ—রাজা থেকে ভিখারি, বানিয়া থেকে ফকির সবাই সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল এই উপহার। সোহাগভরে নাম দিয়েছিল—'কানাইবাঁশি', 'তুলসী মুকুল', 'ঝুলুর ঝুলুর'।

এই বিশাল ভাণ্ডারের অনেকটাই আজ অবলুপ্ত তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবে'র সময়ে কৃষি বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত IR8, IRRI প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের প্রচার ও প্রসারের ফলে চাষীরা দেশী ধানের চাষ ছেড়ে দিয়েছেন। অবশ্য আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্তারা এর মধ্যে কিছু কিছু বীজকে 'সংরক্ষণ' করেছেন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'জিন ব্যাঙ্কে' পাঠিয়ে দিয়ে। যা ছিল জীবন্ত, জীবনদায়ক উৎসব আনন্দ, দুঃখ বেদনার শরিক তা আজ 'সংরক্ষিত' হয়ে আছে লিকুইড নাইট্রোজেনের বাক্সে! কার কি আসে যায়। কিন্তু সব দেশেই কিছু খ্যাপা লোক থাকেন

যাঁদের স্বভাব ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। এই রকম কিছু খ্যাপা লোকজন বৈজ্ঞানিক, কৃষক, ছাত্র, স্বয়ংসেবী সংগঠনের কর্মী মিলে কোমর বেঁধেছেন আমাদের ঐতিহ্য, 'ধরোহর'-কে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য। এদেরই উদ্যোগে গত ২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'কলকাতা বীজ উৎসব'।

প্রথম দিন ছিল সেমিনার—স্থান ডব্লিউ বি ভি এইচ এ টাওয়ার, আনন্দপুর, কলকাতা। এসেছিলেন উড়িষ্যা, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, পন্ডিচেরি, সিংভূম প্রভৃতি জায়গার প্রতিনিধিরা। ভাষণ আর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশেন-এর মাধ্যমে বক্তারা জানালেন কেন এই অমূল্য বীজ ভাণ্ডারকে হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিৎ নয়। যা হারিয়ে গেছে তার কিছু কিছু আন্দাজ পেলাম—পুরীর জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য এক সময় ৩৬৫ রকমের বিভিন্ন প্রজাতির ধানের চাষ হত। আজ বেচারা জগন্নাথকেও রোজ একই চালের ভাত খেতে হচ্ছে। বক্তারা জানালেন তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল বীজের কলকাঠি। এর জন্য চাই প্রচুর জল যা আসছে ভূ-গর্ভস্থ জলভাণ্ডার থেকে, চাই প্রচুর রাসায়নিক সার যা আসছে সঞ্চিত খনিজ ভাণ্ডার থেকে, চাই প্রচুর কীটনাশক যা বিষিয়ে দিচ্ছে জল-মাটি-বাতাসকে। এতদসত্ত্বেও 'উচ্চ ফলনশীল' বীজ বেশিদিন উচ্চফলনশীল থাকে না। বছর দশেকের মধ্যেই কমতে থাকে উৎপাদনের মাত্রা। দেশী ধানের ফসল থেকে কৃষকরা পরের বছরের জন্য বীজ রেখে দিতেন। 'উচ্চ ফলনশীল' বীজ কিন্তু সে ভাবে রাখা যাবে না। প্রত্যেক বছর কৃষককে বীজ ধান কিনতে হবে দোকান থেকে অর্থাৎ মাল্টি ন্যাশনাল বীজ কোম্পানি এবং দেশীয় দালালদের থেকে! খুড়োর কল আর কাকে বলে!

এবং শুধু ধান নয়—জোয়ার, বাজরা, সর্ষে, তিসি—এমনকি ফল এবং শাকসব্জির চাষেও চলছে মাল্টিন্যাশনাল বীজ কোম্পানিগুলির আক্রমণ। বি টি কটন এবং হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যার খবর তো আমরা সবাই জানি। এবার এসেছে বি টি বেগুন।

সেমিনারের বক্তারা জানালেন কিভাবে এই হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা লড়ে যাচ্ছেন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, ছত্তিশগড়ের ভীল মায়ের আঁচল থেকে অথবা কর্নাটকের কোনও প্রকৃতিপ্রেমী কৃষকের ভাণ্ডার থেকে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ধান, জোয়ার, বাজরা এমনকি নটে শাকের দেশী বীজ। শুধু সংগ্রহ নয় তাঁরা চাষ করেছেন, বাড়িয়ে তুলেছেন সংগৃহীত দেশী বীজের ভাণ্ডার এবং পৌঁছে দিচ্ছেন চাষীদের ঘরে ঘরে। তাঁরা হাতে কলমে প্রমাণ করেছেন দেশী বীজ রাসায়নিক সার অথবা কীটনাশক ছাড়াই যা ফসল দিচ্ছে তা অনায়াসে উচ্চ ফলনশীল বীজের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে।

বীজ উৎসবের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৮ এবং ২৯ এপ্রিল মিডলটন রোড-এ আর্থ কেয়ার বুক সেন্টার-এর উঠোনে উদ্যোক্তারা লাগিয়েছিলেন প্রদর্শনী। চাক্ষুষ দর্শন হল সেই হারিয়ে গিয়ে খুঁজে পাওয়া অমূল্য বীজ রত্নগুলির, দেখলাম 'রাজামুণ্ডি' ধান যা মহিশূরের মহারাজাদের হেঁসেলে ব্যবহার হত, অন্ধ্রের সুগন্ধি 'জিরাসাম্বা', দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোনা জলের ফসল 'গেউস' আর 'শোলের পোনা'। শুধু ধানই নয় ছিল লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, বেগুন, নটে শাক, সার পিডিং শাকের বীজ। আর ছিল বই-এর দোকান—প্রদূষণ, জৈবিক ক্ষেতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর অজস্র বই।

সবুজ বিপ্লবের এবং উচ্চ ফলনশীলের বীজের দরকার এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল, এ ছাড়া ৬০-এর দশকের চরম খাদ্যাভাব এবং খাদ্য বিদেশী নির্ভরতা থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হত। কিন্তু আজ সময় বদলেছে, আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর। অন্যদিকে জি এম বীজ, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের কুফলগুলি ফলতে শুরু করেছে। তাই আজ বোধহয় বলবার সময় হয়েছে 'দাও ফিরে তুলসী মুকুল ...'।

উমা

প্রিয় সম্পাদক,

জয় হোক উৎস মানুষ-এর। প্রচ্ছদসহ এত সুসংকলিত সংখ্যা বহুদিন দেখি নি। পুরানো প্রচ্ছদের নক্সাতে রঙের ব্যবহার—সব মিলিয়ে অভিনব ও প্রশংসনীয়। যিনি পরিকল্পনা করেছেন, তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাই।

সবচেয়ে অবাক হয়ে গেছি ঋগ্বেদে আবহ-চেতনা বিষয়ক লেখাটি পড়ে। অজানা চৌধুরী শুধু যে অনেক অজানা তথ্য উপহার দিয়েছেন, তাই নয়, তাঁর প্রকাশভঙ্গীও কী সুন্দর! তাঁকে যত সাধুবাদই দিই না কেন, সেটা যথেষ্ট নয়। আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—'এতদিন কোথায় ছিলেন' এই লেখিকা? শুধু দু-একটি প্রশ্ন জাগছে লেখাটি সম্পর্কে। যেমন, লেখাটির উদ্ধৃতিগুলো ঋগ্বেদ থেকে পড়লে পাঠক তা ক্রমে ক্রমে বুঝতেই পারেন, তবু অধ্যায় ও সূত্র-সংখ্যার (মণ্ডল-বাক-অনুবাক) উল্লেখ থাকলেও তার সঙ্গে ঋগ্বেদ শব্দটির উল্লেখ একবারও করা হয় নি। অন্তত শুরুতেই উদ্ধৃত শ্লোকটির সঙ্গে ঋগ্বেদের উল্লেখ থাকলে ভালো হত নাকি? এই লেখাটির আরেকটি অংশ সম্পর্কেও একটি ছোট প্রশ্ন, ৩১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় চতুষ্কোণের যে মাপ দেওয়া হয়েছে (0".7 x 0".7)—সেটা কি ঠিকভাবে ছাপা হয়েছে? এটা যদি ছাপার ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো আমার বুঝতে ভুল হয়েছে, এমনটাও হতে পারে। যাই হোক, উৎস মানুষ-এর পাতায় এই বিদগ্ধ লেখিকার আরো লেখা দেখতে পাবো, এই আশাই করব।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাসহ
অলক বসুচৌধুরী
জামসেদপুর

ধান সংস্কৃতি

অনুপম পাল

ধান সংস্কৃতি: ধান সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের খাদ্য। মোট ধানের ৯২% এশিয়ায় উৎপাদন হয়। মূলত পূর্ব এশিয়ার মূল খাদ্য হলেও এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার মানুষ ভাতের সংগে অভ্যস্ত হয়েছেন। ধানের অভিযোজন ক্ষমতা ভালই। সমুদ্র তলদেশ থেকে ১৭৫০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ধান চাষ হচ্ছে। কেরালার ওয়াইনাড পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে সমুদ্র তলদেশ থেকে ৩ মিটার নিচে ধান চাষ হয়। আমাদের পূর্বভারতের জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতি ধানকে ঘিরে। ধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লোকাচার, লোক বিশ্বাস, প্রবাদ, প্রবচন, গান, খাদ্যাভ্যাস, গো-পালন, মাছধরার জাল, ঘুনি ইত্যাদি এবং কুটির শিল্প। ঢেকিতে ধান ভাঙানোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সমবেত ভাবে গাওয়া ধান ভাঙানো গান। এখন সেই সব গান লুপ্তপ্রায়। ধান এখন স্থানীয় ধান ভাঙানো কলে বা বড় মিলে চাল ভাঙানো হয়। এরই সাথে গ্রামীণ মেয়েদের *সঙ্গীতমুখর* আনন্দের কর্মসংস্থান চলে গেল। সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ঢেকি মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ব্যায়াম। ঢেকিতে ধান ভাঙানো ছাড়া চিঁড়ে কোটা, মুড়ির ছাতু, চালগুড়ো, মশলা ভাঙানো এসবই হত বাংলায় ধানকেন্দ্রিক সংস্কৃতি প্রায় অবলুপ্ত। বাড়ির অতিথি ও জামাইকে খাওয়ানো চাল, পূজোর উপকরণ হিসেবে সুগন্ধি চাল, মুড়ির, খইয়ের, পান্তার চাল আজ অনেকের কাছে অলীক মনে হতে পারে। কিছুদিন পরে হয়ত এসব রূপকথার মতো মনে হবে। এখন সরু চালের কথা বললে শহর থেকে গ্রামের আধুনিক প্রজন্মের সবাই বলেন আধুনিক জাত মিনিকিট চালের কথা। ইদানিং জিরাকাঠি ও বাঁশকাঠি নামে দুটি দেশী সরু চালের বাজারে খুব চাহিদা। কিন্তু জিরাকাঠি বলে কোনও দেশী ধানের উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং ধান সরু ও সুস্বাদু চাল বলতে ঝিঙেশাল, দুধেশ্বর, সীতাশাল, চামরমনি, কাটারি ভোগের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছেন। কেউ বলবেন এর চাহিদা কম কিংবা এর ফলন কম। কিন্তু এই চাল বাজারে বিক্রি হবে না এমনটা নয়। দেশী হাঁস-মুরগীর ডিম, টমেটো এখনো মানুষ কেনেন।

ধানই প্রাণ, ধানই ধন, লক্ষ্মীর প্রতীক। বাংলার বিনোদ রাখালের পালায় কিছু বাংলার ধানের উল্লেখ অছে।

আড়াই দিবসের ধান মউরপাতা আনিরবান
আছাড়মনি কজর নিমাই।

বন্ধতুলসি গয়াবালি মুক্তারগিরি আধারকুলি
মাথানুইয়া দিল চাই

সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরামের কল্পনায় কমলামঙ্গল কাব্যের ধান্যলক্ষ্মী অভিধাটিতে লক্ষ্মীদেবী যথার্থই হয়ে উঠেছেন ধান্যলক্ষ্মী। ওঁর পায়ের আলতা হয়ে হল কিরণধান, কনকচূঁড় ধান দেবীর পাসুলি, খইহার গলার হার, পারিজাত ধানের মালা সাতনরী হার, লক্ষ্মীকাজল ধান দেবীর কেশরাজির অলংকার। ধর্মপূজাবিধান, কবি কঙ্কন রচিত লক্ষ্মী সরস্বতী পুঁথিতে ও শিবায়নে অসংখ্য ধানের নাম রয়েছে। পৌষমাসে ধান কাটার পর পুষ্যযাত্রা উৎসবের মূলকথা মালক্ষ্মী যেন আমাদের ধান ক্ষেত রক্ষা করেন। ধানের বৃদ্ধি হলেই জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। পৌষলক্ষ্মী-র আরেক রূপ হল নবান্ন। নতুন ধান ওঠার পর নতুন চালের পুলি, পিঠে ও পায়েস বাংলার ঘরে ঘরে তৈরি হত। প্রতিবেশির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান চলে। বৈদিক শ্রী (লক্ষ্মী) হয়েছেন বৌদ্ধদের সিরিদেবী বৌদ্ধদের লক্ষ্মী হলেন জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার প্রতীক। ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের দেবী। জৈনদের মধ্যে লক্ষ্মীর মর্যাদা অনুরূপ। সুজাতা যে চালের পায়েস অনশনরত বুদ্ধদেবকে দিয়েছিলেন সেই ধানের চাষ এখনো হয়। প্রায় আড়াই হাজার বছরের কালানমক সুগন্ধি ধান উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাঞ্চলে আজও হয়। বৃহস্পতিবারকে হিন্দুরা লক্ষ্মীবার বলে থাকেন। কোনও কোনও অঞ্চলে মুসলমানরা এই রীতি মেনে চলেন।

ধান নাম: তামিল শব্দ আরিসি থেকে বিভিন্ন ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ইংরেজি শব্দ রাইস। আনুমানিক ৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত থেকে বাসমতি ধান গ্রীসে নিয়ে যান। তাঁর গৃহশিক্ষক ও জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক অ্যারিস্টটল ধানের নাম দিয়েছিলেন *ওরাইজন*। শব্দটি গ্রীক ওরুজা শব্দ থেকে এসেছে। ধানের বর্তমান বৈজ্ঞানিক নাম *ওরাইজা সাটিভা*। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ধানের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় নামগুলি হল—জার্মানে রেইস, ডাচে রিজিস্ট, ফরাসিতে রিস, লাটিনে ওরাইজা, স্প্যানিশে আর-রোজ। ধান আরব বণিকের মাধ্যমে য়ুরোপে প্রবেশ করে। আরব বণিকের *আল রুজ* পরিবর্তিত হয়ে স্প্যানিশের *আর-রোজ*। ইরানি শব্দ *বেরেঞ্জ*, তুর্কি শব্দ *পিরিনক্*-এর সঙ্গে ব্রীহির মিল আছে। ধান ভারত থেকে ইরান হয়ে তুরস্ক পৌছয়, পরে য়ুরোপে যায়। আবার বাংলার শালি

জমি, বর্ষার ধানকে শালি ধান বলে। জল জমা ধানের জমিকে শালি জমি বলা হয়। আবার ধানের নামের সঙ্গে শালি শব্দ যোগ করে বিভিন্ন ধানের নাম দেওয়া হয়েছে। কবিরাজশাল, ঝিঙেশাল, রূপশাল। বাংলাদেশে শালকে শাইল বলে যেমন ঝিঙাশাইল। মধ্য প্রাচ্যের উজবেক ভাষায় চালকে বলা হয় *শোলি* এবং উইঘুর ভাষায় বলা হয় *শালি*। হতে পারে ভারতে আসা ওই অঞ্চলের শাসকদের মাধ্যমে এখানকার ভাষা ওখানে চালু হয়। সংস্কৃতে ধানের নাম *ব্রীহি*। আরেক মতে ভারতের সংস্কৃত নাম *ব্রীহিয়া*।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে ধানের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। চীন ও জাপানে খাদ্যের সমার্থক ধান। *আপনি কেমন আছেন* না বলে চীনারা বলেন *আপনি কি আজকে ভাত খেয়েছেন?*

এখনকার ধানবাদ শহর গড়ে ওঠার আগে ধানের আবাদ হত। বাংলায় ঘরের ছাদকে চাল বলা হয়, আবার চালচুলোহীন মানুষ, চাল বাজ এই কথাগুলো চালু আছে। বিবাহ, অন্নপ্রাশনে ধান ছাড়া সম্ভব নয়। খই-এর ব্যবহার, হিন্দু মৃতব্যক্তি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময়, বিবাহে খই পোড়ানো বহুল প্রচলিত রীতি। বৌভাত শব্দটা ভাতের সঙ্গে যুক্ত, অন্য কোনো দানা-শস্য নয়।

ধানের উদ্ভব: পোয়েসি পরিবারভুক্ত ওরাইজাগণের দুটি প্রজাতি আছে—এশিয়ার ধান *ওরাইজা সাটিভা* এবং আফ্রিকার ধান *ওরাইজা গ্লাবেরিমা*। এই ধান খরা সহ্য করতে পারে কিন্তু এই ধান আফ্রিকা মহাদেশের কিছু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এশিয়ার ধানের উদ্ভব হয়েছে বর্ষজীবি *ওরাইজা রুফিপোগোন* থেকে। *ওরাইজা সাটিভার* প্রধানত দুটি উপপ্রজাতি আছে। ঠাণ্ডা অঞ্চলের *জাপোনিকা—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার* চীন জাপান প্রভৃতি দেশে হয়। সাধারণত এর গাছ বেঁটে, মোটা চাল, আঠালো ভাত হয়। আর গরম আবহাওয়ার জন্য *ইন্ডিকা*—ভারত উপমহাদেশে হয়। গাছ বেঁটে থেকে লম্বা, *ভাত আঠালো নয়*, সরু থেকে মোটা দানা। চালের রং সাদা, কালো ও লাল হয়। খোসার রঙের সঙ্গে চালের রঙের মিল না থাকতে পারে। কালো খোসা যুক্ত চালের রঙ লাল (কালো বোরো), খড়ের রঙ যুক্ত ধানের চালের রঙ লাল (অগ্নিবান), খড়ের রঙ যুক্ত ধানের চালের রঙ কালো (কালোভাত) ইত্যাদি।

চীনের ইয়াংসি নদী ধারে প্রাপ্ত ফসিল অনুসন্ধান করে মনে করা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ১০০০০ বছর আগে ধান চাষ শুরু হয়। ভারতে প্রায় ৮০০০ বছর আগে ধান চাষ শুরু হয়। ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার ও যবের মধ্যে ধানই সর্বাধিক বীজ উৎপাদন করতে পারে। একটি বহুরূপী ধানের শীষ থেকে সর্বাধিক ৬০০টি ধান পাওয়া যেতে পারে এবং এর মধ্যে ৫০০টি পুষ্ট ধান পাওয়া যেতে পারে।

জাত বৈচিত্র্য: ধান এমনই এক ফসল যার থেকে সবথেকে বেশি জাত নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (২০০৩)-এর তথ্য অনুযায়ী ফিলিপাইন্সের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে ৮৬১৯৪টি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশী ধানের জাত রয়েছে। প্রকৃত অর্থে এর থেকে অনেক বেশি জাত ছিল। এই একটি প্রজাতি থেকে সর্বাধিক সংখ্যক জাতের উদ্ভব হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সের রিপোর্টে ভারতে ৮২০০০ ধানের জাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩০ সালের ইংরেজদের এক সমীক্ষায় জানা যায় দুই বাংলায় প্রায় ১৫০০০ ধানের জাতের কথা। পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৫৫০০ জাত এক কালে চাষ হত। এর মধ্যে কিছু ধানের দু'তিন রকম নাম থাকতেও পারে। দুই বাংলায় ১০০ রকমের বেশি সুগন্ধি ধান ছিল। এর মধ্যে গোবিন্দভোগেরই রমরমা, সুগন্ধি ধান মানেই যেন গোবিন্দভোগ। হতে পারে দেবতার নৈবেদ্যের সঙ্গে গোবিন্দ নামের একটা যোগসূত্র আছে। রাধাতিলক, কালোনুনিয়া, তুলাইপাঞ্জি, রাধুনিপাগল, লালাবাদশাভোগ, তুলসিমঞ্জরি, তুলসিমুকুল ইত্যাদি সুগন্ধি চালের বহুল প্রচলন ছিল। পূজোর জন্য, খিচুড়ির ও পরমান্নের জন্য ছোট দানার সুগন্ধি চালের কোনও বিকল্প নেই। বাংলাদেশে পোলাও চাল বলে বহুল প্রচারিত। কৃষকের জমিতে স্বাভাবিক ভাবেই চাষের মাধ্যমে ধান সংরক্ষিত হত, এর জন্য কোনও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজন হয় নি। ১৯৭৫-১৯৮৩ সালের মধ্যে চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র ফিলিপাইন্সের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রকে ৩৫০০ ধানের জাত প্রদান করেন (দেব ২০০৫)। ভারত থেকে ওই কেন্দ্রে মোট ১৬০১৩টি ধানের জাত পাঠানো (পাচার) হয়, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার ১৩টি দেশের মধ্যে ভারতের পরে স্থান ছিল লাওসের (১৫২৮০) এবং সবথেকে কম ছিল শ্রীলংকার (২১২৫)। উচ্চ ফলনশীল ধানের দাপটে দেশী ধান প্রায় নিশ্চিহ্ন, পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের জমিতে মেরেকেটে ১০০-র কাছাকাছি জাত পাওয়া যেতে পারে। ইংরেজ আমলের ১৮৮০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তামিলনাড়ুর সালেম ও থাঞ্জাভুর জেলায় ধানের ফলন ছিল ৩০-৩৫ মন বিঘায় (৯-১০.৫ টন / হেক্টর) যা এখনকার কোনও আধুনিক বা শংকর জাতের ধান দিতে পারে না। মসলিন কাপড়ের মতো এই আঞ্চলিক ধানও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দেশী ধানের স্বপক্ষে এই উদাহরণ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পুস্তকে দেওয়া হয় না।

আমাদের পূর্বপুরুষরা ধানের জমি থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধানকে চিহ্নিত করে নির্বাচন করেন যা পরবর্তী প্রজন্মে চাষ করে দেখা হত আগের চরিত্রগুলি ঠিক থাকছে কিনা। কয়েক প্রজন্ম করবার পর জাত নির্বাচিত হত এবং নামকরণ করা হত। তাঁদের প্রথাগত শিক্ষার কোনও প্রশ্ন ছিল না। এখনকার জিন, প্রোটিন, বংশগতিবিদ্যা, পরিসংখ্যান কিছুই না জেনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক ধানের জাত তৈরি করেছিলেন কয়েক শতাব্দী ধরে।

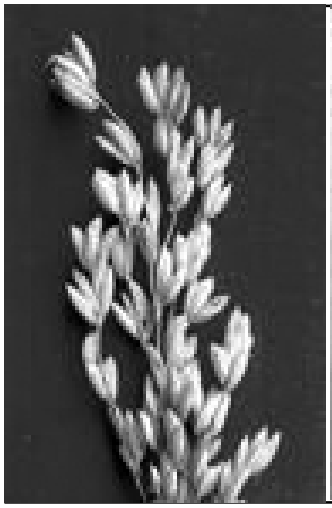

খেজুরছড়ি ধান

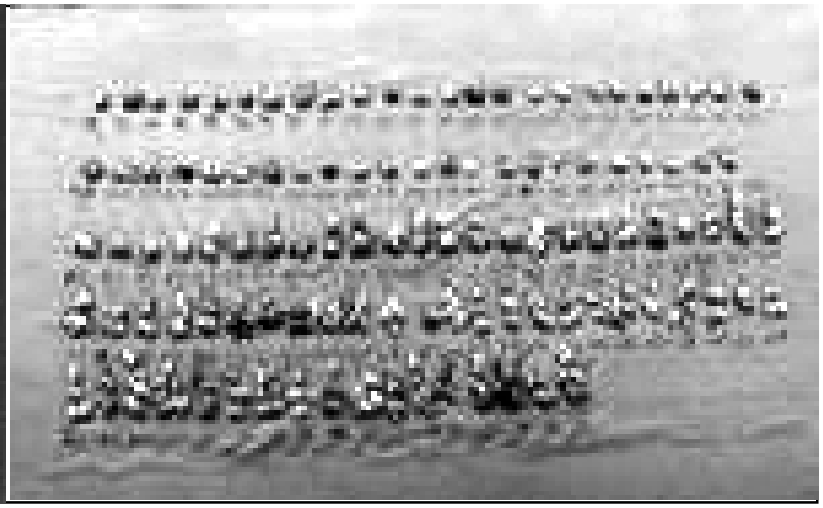

খেজুরছড়ি ধানের ক্ষেত থেকে পাওয়া প্রকরণ

সেই সব নাম না জানা কৃষকদের প্রতি আমাদের কোনও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। ২০১১ সালে ফুলিয়ার গোয়ালপাড়া গ্রামের প্রগতিশীল চাষী শ্রী প্রভাত দে খেজুরছড়ি ধানের মধ্যে ১৩০ রকম প্রকরণ খুঁজে পেয়েছেন এবং এই বছর এর মধ্যে থেকে বাছাই করে আলাদা ভাবে চাষ করবেন এবং এই পদ্ধতিতেই নতুন ধান নির্বাচিত হয়। বারানসীর প্রগতিশীল কৃষক জয় প্রকাশ সিং প্রায় ১০০টি ধানের ও ১০০টি গমের জাত উদ্ভাবন করেছেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ব্লকের বাজিতপুর গ্রামের শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বাছাড় ৮-১০ ধানের জাত নির্বাচন করেন, এর মধ্যে লালকামিনী ও ভারত পাটনাই ওই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরা কেউই প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। ইদানিং কৃষকদের উদ্ভাবনী শক্তির গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মনে হয় এই সব দেশী ধান সবই ইসলামিক যুগের আগেই নির্বাচিত হয়েছিল। বাদশাভোগ ও যশোরের আলমভোগ ইত্যাদি দু-একটি ছাড়া আর কোনও ধানের নাম ইসলামিক নয়।

বিশেষ কায়দায় জাপোনিকা ধানের সঙ্গে ইন্ডিকা ধানের ক্রশ করে উচ্চফলসশীল ধানের উদ্ভব হয়েছে। যেমন আই আর ৮ বা ইন্টারন্যাশনাল রাইস -৮ (এখন আর চাষ হয় না), আই আর ৩৬, ৫০, ৪২, এম টি ইউ ৭০২৯ (লালস্বর্ণ)। *এগুলি রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ ও সেচের ফলে নোনা ও গভীর জল ছাড়া সমতল জমিতে বেশি ফলন দিতে পারে*। এ পর্যন্ত এই আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধানের সংখ্যা প্রায় ৬০০ হলেও প্রতি রাজ্যে ৬-৭টি জাতের বেশি চলে না। প্রথম দিকে আধুনিক জাতগুলির ফলন ম্যাজিকের মতো বেড়েছিল, চমকে দেওয়ার মতো ফলন ছিল। প্রচারের ঢক্কানিনাদে দেশী ধানের গুরুত্ব হারিয়ে গেল। চাষীরাও ধীরে ধীরে আধুনিক জাতের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হলেন। এখন বহুল প্রচলিত আধুনিক জাতের লালস্বর্ণ ধানের ফলন আগে বিঘা প্রতি ২২ মণ হত এখন তা থেকে নেমে ১৩-১৩ মণে ঠেকেছে। যদিও আগের থেকে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ দেখা যাচ্ছে অনেক দেশী ধানের ফলন গোবর সার দিয়েই বিঘা প্রতি ১৬-১৮ মণ। আমাদের দেশের বহুরূপী, কেশরলাল, বউরাণী, পুরুলিয়ার নির্বাচিত কেরালা সুন্দরী ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১৫০১৭ মণ (৪.৫-৫ টন/হেক্টর) হলেও তা প্রচার করা হয় না। অন্যদিকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার কেলাস, ভুতমুড়ি, বিষমণি, আসানলয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দোরাঙ্গি, আজ্জুমোটা, গাদিকুম, কুমরাগোড়, মেদিনীপুরের জটা, জঙ্গলিজটা ইত্যাদি চালের ভাত পেটে অনেকক্ষণ থাকে, অল্পতেই পেট ভরে যায়। একবার বীজ সংগ্রহ করলে সারা জীবন কেন কয়েক প্রজন্ম চাষ করা যাবে। শুধু বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি যেন ঠিক হয়। বাসমতি ধান, কালানমক ধান কয়েক হাজার বছরের ধান, এখনও চাষ হচ্ছে। হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের সনাতন মণ্ডলের পরিবার রাণীআকন্দ ধানটি তিন প্রজন্ম ধরে (১০০ বছর) চাষ করছেন, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের নারায়ণ চক্রবর্তী ৭০ বছর ধরে বকুলফুল ধানটি চাষ করে আসছেন। এতে কোনও রাসায়নিক সার বা কীটনাশক লাগে না। অথচ সামগ্রিক ভাবে রাসায়নিক কৃষির অবক্ষয়ের জন্য কৃষককে দোষারোপ করে বলা হল কৃষক নাকি প্রযুক্তি ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারছেন না। যাঁরা কয়েক প্রজন্ম ধরে চাষবাস করছেন তাঁরা চাষ করতে পারে না এই মার্কিন ধারণাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে আমাদের কৃষিপ্রযুক্তিবিদরাও অবলীলাক্রমে বলে চলেছেন। এমন কোনও উদাহরণ এই লেখকের জানা নেই যে কৃষিপ্রযুক্তিবিদরা কৃষকের ক্ষয়িষ্ণু জমি নিজেরা সরাসরি চাষ করে আবার আগের অবস্থা এনে দিয়েছেন এবং ফলন আগের মতো

১৮ মণ হচ্ছে। রাসায়নিক সার ও বিষের প্রভাবে কিছু জমিতে ওই রকম ফলন হতেই পারে, এর সঙ্গে অনুকূল আবহাওয়া থাকলে ফলন ভালো হবে। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা আগের মতো নেই। অনেক কৃষকই বুঝতে পারছেন ব্যবসায়িক ধাপ্পাটা কোথায়, ইতিমধ্যে নিজের বীজ হারিয়ে ফেলেছেন, বীজটাও অন্য বাজারি পণ্যের মতোই একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। বীজের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে গেলে তখন কৃষকের সংজ্ঞা কী হবে! বীজের অধিকার না থাকলেও যিনি চাষ করেন তিনিও কৃষক! যে চাষী লবণ ছাড়া প্রায় সারা বছরের সব খাদ্যই উৎপাদন করতেন তিনি বেছে বেছে শুধু মাত্র বেশি লাভজনক ফসলগুলির চাষ শুরু করলেন। ফসল বৈচিত্র্য লোপ পেতে শুরু হয়। গণমাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের ব্যাপক প্রচারে দেশজ ফসল বৈচিত্র্য ঢাকা পড়ে গেল। শুধু ধানের ওজনটা দেখতে গিয়ে স্বাদ বৈচিত্র্য, খড়ের পরিমাণ, ধান মাছ ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক বেশি উৎপাদনক্ষম ধান ইত্যাদি ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হল না। অধিক লাভ, বেশি ফলনের গল্প ফেঁদে ইদানিং হাইব্রিড ধানের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে মানুষের খেতে পাওয়ার কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। প্রশ্নটা হল বন্টন ব্যবস্থা ও ক্রয় ক্ষমতার। ২০১১ সালে ভালো বৃষ্টির জন্য গোটা ভারতে প্রায় ২৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদনও ভালো হয়েছে, চাষীরা ধানের দাম পায় নি। এর পর আবার *বেশি ফলনের ধান*। বহু বিতর্কিত জিন শস্য ধান—বিটি ধান (মাজরা পোকা ও পাতা মোড়া পোকার আক্রমণ কম হবে), ভিটামিন এ ও লোহা সমৃদ্ধ জিন পরিবর্তিত ধান নিয়ে মাতামাতি করবার চেষ্টা করছেন। উপরের ধানের পোকা ধানের কোনও সমস্যা নয় এবং ভিটামিন এ ও লোহা সমৃদ্ধ জিন পরিবর্তিত চাল মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়, তাছাড়া এর নিরাপদ, সহজলভ্য ও পরীক্ষিত বিকল্প আছে।

ধান চাষের এলাকার পরিসংখ্যান: বাংলার সব জেলাতেই ধান চাষ হয়। আউশ, আমন ও বোরো মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট ধান চাষের এলাকা হল ৫৯৩৫৬৯৬ হেক্টর। সবথেকে বেশি হয় পশ্চিম মেদিনীপুর (৭১৮৯২৭ হেক্টর), এর পর বর্ধমান (৬৬৬৫৪১ হেক্টর)। আউশ, আমন ও বোরো ধরে ২০১০-১১-এর তথ্য অনুযায়ী হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২.৫ টন ২০০৮-০৯-এ যা ছিল ৩.৮ টন/হেক্টর। আউশের এলাকা ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫১০৫২৮ হেক্টর থেকে ২০০৮-০৯ কমে দাঁড়িয়েছে ২৮২৪৪৪ হেক্টরে। ওই সময় আমনের এলাকা ৩৩৬২১২২ হেক্টর। ওই সময়ে বোরো এলাকা ১১৬০১৩১ হেক্টর থেকে ১৫৫৬৬৬২ হেক্টর হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৃষি দপ্তর বোরো চাষ বৃদ্ধির জন্য ইদানিং আর উৎসাহ প্রদান করছেন না। কারণ হিসাবে ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, আর্সেনিক জনিত সমস্যা, জলতল নেমে যাওয়া ইত্যাদি। এক কেজি বোরো ধান তৈরি করতে ৩০০০-৪০০০ লিটার জল লাগে। সুতরাং এক বিঘা বোরো ধান উৎপাদন করতে কি বিপুল জল লাগবে তা অনুমেয়।

ধানের পুষ্টিগত গুণ: ধান প্রধানত শর্করা জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে। সব বয়সের ভালো খাদ্য এবং পথ্য। এটি সহজ পাচ্য, বিশেষত গ্লুটেন নামক আমিনো অ্যাসিড না থাকার জন্য। বেশ কিছু ঔষধি গুণসম্পন্ন চাল আছে যেমন কেরালার নিভারা—বর্ষাকালীন জ্বরসর্দি উপশম কারক, ব্যথানাশক। কোন ধানে শর্করার পরিমাণ কম। ধানে কোনও ভিটামিন এ (বিটা ক্যারোটিন) নেই, তবে গমে আছে। চালে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ক্যানসার প্রতিরোধকারী ফ্লাভোনয়েড যৌগ ইত্যাদি আছে। তবে এই উপাদানগুলির জাত ভেদে তারতম্য আছে। কালো চালগুলিতে ফ্লাভোনয়েড বেশি আছে, আবার লাল চালগুলিতে লোহা, ভিটামিন বি ইত্যাদি বেশি আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশী জাতগুলির পুষ্টিগুণ নিয়ে বিস্তারিত কোনও গবেষণা হয় নি। গর্ভবতী মায়েদের লাল চালের ভাতের ফ্যান খাওয়ানোর চল ছিল। খাওয়ানোর উপকারিতা ও অভিজ্ঞতার থেকেই এই প্রথা চালু হয়।

ইদানিং খাদ্যের গুণাগুণ বলতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। খাদ্যের মধ্যে প্রাপ্ত শর্করা (আঁশ ছাড়া) রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়া কমার ওপর কতটা প্রভাব এবং তা সমপরিমাণ গ্লুকোজের নিরিখে নির্ণয় করা হয়। গ্লুকোজের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স হল ১০০। মূলত তিন ভাগে এক ভাগ করা খাবারে ফ্যাট থাকলে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমাতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ফসলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স

মান	পরিমান	উদাহরণ
কম	৫৫ বা তার কম	বেশির ভাগ ফল, কাঁচা শাকসবজি, ডাল, মাছ, মাংস,ডিম
মধ্যম	৫৬-৬৯	ঢেকি ছাঁটা চাল (৫৫ বা তার বেশি), গমের আটা, মিষ্টি আলু
বেশি	৭০ বা তার বেশি	মিলের পালিশ করা চাল, পাউরুটি, জেলি

হারিয়ে যাওয়া ধান: ডোডোপাখির মতো হারিয়ে গিয়েছে আমাদের দেশের হাজার হাজার দেশী ধান। কোনও পাঠ্য পুস্তকে এই নিয়ে একটা লাইনও লেখা নেই। সবুজ বিপ্লবের আগে বাংলায় হাজার ধানের চাষ হত। এখন মেরেকেটে বাংলায় ১০০ দেশী ধান পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। চাঁদে ও মহাকাশে যান পাঠানো হয়েছে। ওপেন হার্ট শল্যচিকিৎসা হচ্ছে, বহু বিতর্কিত জিনে পরিবর্তিত শস্য তৈরি হয়েছে, স্টেম সেল চিকিৎসা হচ্ছে এবং তথ্য প্রযুক্তির অনেক

অন্যান্য শস্যের সঙ্গে চালের পুষ্টিগুণের তুলনা
(প্রতি ১০০ গ্রামে)

শস্য	ক্যালোরি কি ক্যাল	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	ক্যাল (গ্রাম)	ফস (গ্রাম)	লোহা (মিগ্রা)	থায়ামিন (মিগ্রা)	নিয়াসিন (মিগ্রা)	রিবো (মিগ্রা)
চাল (সিদ্ধ, ঢেকি)	৩৪৮	৮.৫	০.৬	৭৭.২	০.২	০.০১	০.২৮	২.৮	০.২৭	৪.০	০.১২
চাল (মিল)	৩৪৫	৬.৪	০.৪	৭৮.৯	০.২	০.০১	০.১৫	২.২	০.২১	৩.৮	০.০৫
আতপ	৩৪৯	৮.৫	০.৬	৭৭.২	০.৬	০.০১	০.১৭	২.৮	০.২১	২.৪	০.১১
মুড়ি	৩২৭	৭.৫	০.১	৭৪	৪.৫	০.০২	০.১৬	৬.২	০.২১	৪.১	০.০৮
চিড়ে	৩৪৬	৬.৬	১.২	৭৭.৩	৮.২	০.০২	০.২২	৫.৫	০.১২	৪.১	-
খৈ	৩৬৩	৭.২	০.৪	৮২.৬	০.০৯	০.০৯	-	০.৯	-	১.৪	০.০৩
গমের আটা	৩৪৮	১২.৮	১.৫	৭১.২	১.২	০.০৫	০.৩২	৫.২	০.৪৫	৫.০	০.১৭
ভুট্টা	৩৪২	১১.২	৩.৬	৬৬.২	২.৭	০.০১	০.৩৩	২.১	০.৪২	১.৪	০.১
কাওন	৩৩৪	১২.৩	৪.৭	৬০.৬	৮.০	০.০৯	০.২৯	৬.৩	০.৫৯	০.৭	০.১১

সূত্র:খাদ্য বিশ্লেষণ, বীরেশ চন্দ্র গুহ, ১৯৯৪, ভারতীয় চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদ; প্রবন্ধটি রয়েছে সমর রায়চৌধুরি প্রণীত খাদ্য ও পথ্য গ্রন্থে (পশ্চিম পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা)।

উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক হারানো কোনও ফসল, উদ্ভিদ বা প্রাণীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। প্রজাতি বা জাত হারিয়ে যাওয়া মানব সভ্যতার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। ফসলের বিভিন্ন জাত মানেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জাত। এই ধানের মধ্যে রোগ, পোকা প্রতিরোধ ও বেশি ফলনের ক্ষমতাও আছে। কোনও জাত উদ্ভাবন করতে হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের জাত হারিয়ে গেলে এই দেশী জাতের প্রয়োজন পড়বে। এবং এই জাত থেকেই ভবিষ্যতে অন্য কোনও জাত তৈরিতে কাজে লাগতে পারত। কিন্তু ফসলের জাত হারিয়ে গেলে তা আর সম্ভব নয়। দেশী ধানগুলি বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে, বিষ সারও লাগে না। পরিবেশ বান্ধব এই চাষের খরচ কম।

সংরক্ষণের উদ্যোগ: এই ধানগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ, গোটা পৃথিবীর জৈব সম্পদ। ফসল বৈচিত্র্যই ভবিষ্যৎ খাদ্য সুরক্ষার সহায়ক। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ফসল সম্পদের মূল্যায়নে যথেষ্ট রয়েছে। আশার কথা বিভিন্ন সংগঠন, কৃষক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে ধান গবেষণার কাজ শুরু করেন চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রটি। তাঁদের সংগ্রহে ৮০০ দেশী ধান রয়েছে। তবে ডঃ দেবল দেবের উদ্যোগে বাঁকুড়ার বসুধায় অবস্থিত **ব্রীহি** ১৯৯৪ সালে দেশী ধানের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের কাজ শুরু করেন। এ পর্যন্ত ৪১৬টি জাতের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন (*সিডস্ অফ ট্র্যাডিশন সিডস্ অফ ফিউচার* গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য) এবং সংগ্রহে আছে ৮৬০ দেশী ধান। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের ব্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্রটি হল পূর্ব ভারতের সবথেকে বড় বীজ বিনিময় কেন্দ্র। কৃষকদের বীজ বিতরণ করা হয়। ২০১১ থেকে এই কেন্দ্রের মূল ধান সংরক্ষণ কাজটি ওড়িষ্যার রায়গাড়া জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এটিসি ফুলিয়ার জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ খামারের সংগ্রহে আছে ২২৫টি দেশী ধানের জাত। এখান থেকে কৃষকদের ধান সরবরাহ করা হয়। ভারত সরকার বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের মত, ২০০২ সালে জীব বৈচিত্র্য আইন তৈরি হয়েছে এবং ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে জীব বৈচিত্র্য পর্ষদ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের উবিনীগ (উন্নয়নের বিকল্প নীতিনির্ধারণী গবেষণা) প্রায় ২৩০০ দেশী ধান সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও কৃষকদের মধ্যে বিতরণের কাজ করছেন চারটি কেন্দ্রের মাধ্যমে। দেরাদুনের নভধান্য, কর্নাটকের সাহাজা সমৃদ্ধা, ওড়িষ্যার লিভিং ফার্মস, কেরালার থানাল, সেভ আওয়ার রাইস ক্যামপেনের কৃষকরা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কৃষক দেশী ধান সংরক্ষণ করছেন।

সম্ভাব্য হারিয়ে যাওয়া ধানের তালিকা: কোন কোন দেশী ধান কবে থেকে চাষীর মাঠ থেকে হারিয়ে গেল তার কোনও সঠিক তথ্য নেই। প্রয়োজন বোধ করেন নি কেউ। কারণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে দেশী ধান ও ফসল, জীববৈচিত্র্য, ইকোলজি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। বেগুনের জাত ছিল ৩৬৬৮, নটের ৪৯৩২, ছোলার ১৬৪২৯, জোয়ারের ১৮৮৩৪ এবং ধনে পাতার ৪৯৫টি। দেশের ফসল বৈচিত্র্যের কোনও মূল্যায়ন হয় নি।

দুই বাংলায় হারিয়ে যাওয়া ধানের তালিকা

জেলা	সময়	জাতের নাম
মেদিনীপুর	আউশ	পাতকুরি, আশ্রমশাল, চালি, সুলতান চাঁপা, কাটচালি, তেতকুয়া, আশমতি, আশকাদলাই,
	আমন	কেলেকাটা, ভোমারকানু, পাটনা, লাউশালকাটা, নেমতা, ঢুলিয়া, বাঙ্গী, নানা, দ্রৌপদিশাল, বিভিষণশাল, রাবণশাল, রামচন্দ্রভোগ, জেরিকোমল, খেপাঝিঙা, দাইনাগুড়ি, কোটাধান
সুন্দরবন	আউশ	লাওটামবোরো, অর্জুনশাল, পায়রামণি, গারুয়ামণি, জৈলা, গোটা আউশ, পাটনাইনুর
	আমন	পালুই, ক্ষেতিপাটনাই, আজিমা, গাদিওস, কামারশাল, চঁড়ুইমুখি, চ্যাংভুতিয়া, পাঙ্গাশাল, মাতলা, হ্যামিলটন, মদ্দরাজ, পাতাকাঠি, ল্যাটাশাল, কাজলপাটি, পাটনাই লুরিয়া, ছিলতি, রুকামার
২৪ পরগনা	আমন	ঘুরনি, ফিপারি, হেরেকালিয়া, লতানজনটা, পানাঝুরে, ঘিপালি, ভাতনা, বেকিবাজল, পোলদার, ক্ষীরকন, নোনা, বয়েরনেজা, গন্ধবেনা, মৈপাল, বাসশাল, মোরো, দলপরাঙ্গী, ঘোটা, পাটনাইহুর ২৭ রকমের ধান
	বোরো	গুলিগাটি (গভীর জলের)
নদীয়া	আমন	কেঁকো, ডেঁপো, হেতো, বাউরি, ফকিরমণি, দেবমণি, মাশাল, ফিরশাল, বকশাল, ভজনকর্পূর, অলস, দিঘা
মুর্শিদাবাদ	আমন	কুঁচিল, বনগোড়া, কুসুমশালি, রাধুনিপাগল, ঘিকলা, চিত্রশালি, গঙ্গাজল, জটাগোটা, বলরামভোগ
মানভূম	আমন	ধানগুড়ি, দুধশালি, হেড়বাহা, অন্তরেখা, টিকাররাইস, রাস, কার্তিকা, কাশিফুল,কাড়া, তিলাশালি, ভান
রাঢ় বাংলা	আমন	আমপবন, আজান, অসফুরফুর, উড়াশালি, উত্তমশালি, গুলশালি, কুসুমমালি, তিলমাগরি, তড়া, মাপুই, কেউদমুড়ি, গুড়জুড়ালি, খেমড়া, পাছাল, ধুল্যা, বিড়ি, ভোলা, ভোজ, ভোজরাজ, বুড়োমাতা, পিঁপড়া
যশোর	আমন	ফুলআমন, কালা, নেতপসরা, বুড়ষাকুড়ি, ছত্রভোগ, খেনেমটর, ভারুয়া, মাইতচাউল, লক্ষীদ, মুনার, নেপা
ময়মনসিংহ	আমন	হাসাকুমারিয়া, ফাইল্যাজিরা, কাচকলম, ভাতারি, চাপাইন, কেদাচাক, দোলাই, মধুশাইল, গরফা, বরণ
দিনাজপুর	আমন	চন্দনচুঁড়, সিঁদুরকতুয়া, সূর্যউজল, সলিলা, বুনা, চিঙ্গা, অবরশাইল, দুনি, জমা, করম, কাসার, চিনিডুম্বুর
রঙপুর	আমন	যোগিতলই, ঠুকরিশাইল, ইখরি, ফরাসডুমরা, কোহিতুরমণি, রোয়াইলদার, ছোটাকাশনি, কাঁটাই, চত্রাল
পাবনা	আমন	কালোদীঘা, ভাগুলাদীঘা, জানকরাই, মুক্তাহার, নয়চূড়, ঝুল, নালস, সোনাআঝুল, রাজপল, কাদলস
বগুড়া	আমন	গরহিয়া, ঢালগরহিয়া, কদালোচ, ইন্দা, সতিরা, অতুরা, ঢাকিশাইল, বন্যামুগি, বিলাতকলম, রাইমুগি
বাখরগঞ্জ	আমন	ঘুনসি, চর বালেশ্বর, উজালি, দীঘালি, মৈদল, শিলাৎ, বেণীবাচল, দুলশাল, কালঙ্গী, চৈতমল্লিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জোকা অঞ্চলে দলপরাঙ্গীর ধানের চাল ছিল লাল রঙের, ঘোটা ধান গভীর জলে হত, বোলতার মতো ভাত কিন্তু সুস্বাদু। ১৯৮২-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত চাষ হত। লক্ষ্মীকাজলের চাষও উঠে গেছে। গভীর জলের বোরো ধানগুলি গাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ব্লকের মল্লিকপুর অঞ্চলে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চাষ হত। এই রকম গভীর জলের বোরো ধান কালোবোরো ধানটি এখনো শান্তিপুর ব্লকের গোয়ালপাড়া গ্রামে মাত্র এক বিঘা জলাজমিতে চাষ হয়। এখানে ধানের সাথে মাছও হয় স্বাভাবিক ভাবে, চাষ করা হয়েও থাকে কারণ ওই জলাভূমিতে রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করা হয় না। আগে বোরোতে

বাংলার ধান বৈচিত্র্য ও দেশী ধানের শীষ বৈচিত্র্য

১০-১২ বিঘা চাষ হত, এখন কমে ১ বিঘায় পরিণত হয়েছে। এখন ধান বাদ দিয়ে শুধুই মাছ চাষ হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ধানের চাষও হারিয়ে যাবে অচিরে। উল্লেখ্য ওই জায়গায় আমন মরশুমে খুব বেশি জল থাকার জন্য ধান চাষ অসম্ভব। জলপাইগুড়ির তিস্তার পাড়ে ছোট শনি ও বড় শনি নামে দুটি ধানের চাষ ছিল ১৯৮০-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। সেই ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সতীন (একটি ধানে তিনটি চাল), যুগল (একটি ধানে দুটি চাল), আজ্জুমোটা, গাদিকুম, লবণ সহনশীল ধান মাতলা ও হ্যামিল্টন ধান, আমেরিকান মোটা এখন চাষীর মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কবে হয়েছে তার কোনও সমীক্ষা হয় নি।

ঢাকা জেলায় বোরো মরশুমের দেশী সুগন্ধি চাল ফুলরাতা আজ আর নেই। মেদিনীপুরের সবং-এর কুমোর কানাই, বীরভূমের বনকাঁটা, গঙ্গাজলি, পাঞ্জারশাল, সুগন্ধি ধান কৃষ্ণশাল (১৯৯৫-৯৬) হুগলির পুড়শুড়ায় আউশের লালচাল কালচার ধান (১৯৮০), পুরুলিয়ার শিয়াল ভোমরা, হলুদগাটি, আজ আর চাষীর মাঠে নেই। নিচে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ধানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। মনে করা হচ্ছে ১৯৭৫ সালের পর থেকে উচ্চ ফলনশীল নামক ম্যাজিক ধানের চাষের চল শুরু হওয়ার পর থেকে দেশী ধানের চাষ লুপ্ত হতে থাকে। তবে চাষীর মাঠে কিছু ধানের অস্তিত্ব আবার পাওয়া গেলে খুশির খবরই হবে। সুধী পাঠক বর্গের কাছে অনুরোধ তাঁরাও যদি কোনও হদিশ দিতে পারেন।

চাষ পদ্ধতি: ধান চাষের সব পদ্ধতি অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠির মানুষরাই আবিষ্কার করেছিলেন। আউশে ছিটিয়ে ধান বোনা ও বোনার পর লাঙ্গল দেওয়া ও কাছাকাছি থাকা চারাগুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়, আমন মরশুমে ২-৩টি ধানের চারা এক সাথে নিয়ে এক নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগানো, চারা লাগানোর কিছুদিন পর পাশকাঠি ভেঙে এক-দুকালি করে চারা লাগানো (হুগলি জেলায় চার আট পদ্ধতি বলা হয়), এই পদ্ধতিতে কালোবোরো ধান লাগানো হয় এক কালি (চারা) এক ফুট অন্তর অন্তর ৪০-৪৫ দিনের চারা লাগানো হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। এ ক্ষেত্রে পাশকাঠির সংখ্যা ২০-২২টা হয়। নাগাল্যান্ডের মেলহিটে নামক বিস্ময়কর ধাপ চাষের ধানটির পাশকাঠি হয় ১০০-র ওপর। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৩ ফুট, জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিটিয়ে বোনা হয়। সুতরাং অধুনা চালু

বেশির ভাগ দেশী ধানের তথ্য বর্তমান প্রজন্মের কৃষকদের কাছে নেই। হারিয়ে যাওয়া তথ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পুনরায় কৃষকের সামনে নিয়ে আসা আশু প্রয়োজন। এই জাতীয় সম্পদকে আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন।

হওয়া শ্রী পদ্ধতির মতোই এখানে অনেক পাশকাঠি হয়। ধান গাছ বড় হয়ে গেলে গরু দিয়ে ওপরের অংশটি খাইয়ে দেওয়া হত বা কেটে ফেলা হত। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের সর্ববৃহৎ জলা জমি বল্লি বিলে এইভাবে চাষ হত। জাপানি ধান লাগানোর পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল ধান নির্দিষ্ট ভাবে লাইনে লাগানো শুরু হয় ১৫ সেমি ×১৫-২০ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়। দীর্ঘ মেয়াদি দেশী ধানের ক্ষেত্রে ২০ সেমি-২৫ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়।

দেশী ধানের বিভিন্নতা: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন গুণসম্পন্ন দেশী ধান আছে। এর প্রচার ও প্রসার কোনোটাই নেই। মুড়ির চাল, খই-এর চাল, সরু চাল, দেবভোগ্য সুগন্ধি চাল, মোটা চাল ও পান্তা খাবার চাল ইত্যাদি ছিল। সরু চালের জন্য বালাম (বাংলাদেশে বেশি চাষ হত), চামরমণি, দুধেশ্বর, সীতাশাল, কাটারিভোগ, ঝিঙেশাল এখন লুপ্তপ্রায়। এইসব চালের ভাত খেলে তথাকথিত আধুনিক জাতের সরু চাল শতাব্দী (মিনিকিট নামে প্রচলিত), এম শংকর আর মুখে ভাল লাগবে না। দেশী সরু চালের ফলন কম হলেও অনেক কৃষকই স্বাদের জন্য দেশী ধানচাষ করেন। তুলাইপাঞ্জি, বাসমতি ধানের ফলন কম হলেও এর স্বাদ ও সুগন্ধ অপূর্ব। ভাসমানিকের, কনকচূড়ের ও বাংলাদেশের বিন্নি ধানের খই, মুড়ি-র জন্য মরিচশাল, ঘেউস, বহুরূপী, হামাই, কবিরাজশাল, ভাসমানিক, পান্তাভাতের জন্য রুইজুড়ি, ভুড়িশাল, পানিকলস ইত্যাদি ধান চাষের চল ছিল। কৃষকদের কাছে এর গুরুত্ব তুলে ধরলেই কৃষকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। বেশির ভাগ দেশী ধানের তথ্য বর্তমান প্রজন্মের কৃষকদের কাছে নেই। হারিয়ে যাওয়া তথ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পুনরায় কৃষকের সামনে নিয়ে আসা আশু প্রয়োজন। এই জাতীয় সম্পদকে আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন। পাঠকবর্গ নিচের তালিকা থেকে সহজেই আমাদের বিপুল জৈব সম্পদের কথা অনুমান করতে পারবেন। সম্প্রতি ওড়িষ্যার কোরাপুটের জেপুর অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক কৃষি ঐতিহ্য কেন্দ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অঞ্চলকেই দেশের আউস ধানের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসুন আমরা আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দশকে (২০১১-২০২০) ধান ফসল ও প্রাণ বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেষ্ট হই।

কৃতজ্ঞতা:

ডঃ দেবল দেব, দেব দুলাল ভট্টাচার্য, ব্রীহি, বাঁকুড়া/রায়গাড়া, ওড়িষ্যা; বীরভূমের উৎনাউ সংগঠনের অরুণ রাম; শ্রী প্রভাত দে, ফুলিয়া, নদীয়া; ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশনস অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা; রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিক; সুবীর হাজরা, এটিসি বর্ধমান; ডঃ নির্মলেন্দু সামন্ত, রাজ্য বীজ নিগম; ডঃ এম এ সোহবান, কৃষি পরামর্শদাতা, উবিনিগ, খিলজি রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ; বাংলাদেশের উবিনিগ ও উত্তরণের বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ ও কৃষকবন্ধুরা।

তথ্য সূত্র:

১। Seeds of Tradition - Seeds of Future, 2005, Debal Deb, RFSTE / NAVDAVYA, New Delhi

২। Corporate Promotion of Hybrid Rice in Bangladesh, 2010, M A Sohaban, G R Badal, J Alam Jony, UBINIG, Dhaka

৩। Water and Food Security in Bangladesh Local Context, Strategies and Actions, 2010, Editor Philip Gain, Society for Environment and Human Development, Lalmatia, Dhaka

৪। *The need to conserve food and non food plant species ignored in conventional agriculture*, Anupam Paul, Paper presented at the National Symposium on Assessment and management of bio resources, May 21-22, 2003, University of North Bengal, Dept of Zoology, West Bengal

৫। Indigenous rice: ignored in conventional agriculture, Anupam Paul, 2012, Crop Culture - Biotechnology Biodiversity, Centre for Advanced research and Education (Care) and Saha Institute of Nuclear Physics, pp. 29-38

৬। কৃষি ভাবনা ও দুর্ভাবনা, ২০০৭, অনুপম পাল, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা

৭। কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার ওপর কোম্পানির বিপরীতে জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই, ১৮ ডিসেম্বর ২০১০, চিন্তা, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ.৪-১০

৮। আমাদের ধান বৈচিত্র্য, নয়া কৃষি আন্দোলন—একটি প্রাথমিক তথ্যচিত্র। ২০১০, উবিনিগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

৯। হৃদয়, ধান সংখ্যা, বার্ষিক সংকলন, সম্পাদক লীনা চাকী, জানুয়ারি ২০১১, রাণী আর্ট প্রেস, কলকাতা

১০। বাংলার ধান বৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ, ১৪১৪, অনুপম পাল, বসুন্ধরা শারদ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের মুখপত্র, কলকাতা, পৃ. ৬৪-৬৯।

উমা

বিভিন্ন গুণসম্পন্ন কয়েকটি দেশী ধান

ক্রমিক সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	মন্তব্য
১	খরা সহনশীল	কেলাস, ভূতমুড়ি, জটা, গোড়া, কাখড়ি, কেলে আঁশকাটা, কটকি, আসানলয়া, কালাবকরি ইত্যাদি	বর্ষায় কিছুদিন বৃষ্টি না হলেও বেঁচে থাকে, আউশ হিসাবেও ব্যবহার হয়, ফলন অল্প হলেও অল্প খেলেই পেট ভরে যায়
২	গভীর জলের ধান, জলের সঙ্গে গাছ বাড়ে	লক্ষ্মীদীঘল, মেঘি, জল জাবড়া, কাটারাঙ্গী, কলামোচা, সোলে, হোগলা, হড়মানোনা	বেশির ভাগ মোটা চাল, মুড়ি ভাল হয়, মাছ গেড়ি গুগলিও হয়
৩	গভীর জলে ৫-১৫ দিন ডুবে থাকতে পারে, পচে না	লাঙ্গলমুঠি, কইজুড়ি, হোগলা ব্যাত, মাছরাঙা কেরালা সুন্দরী (৫ দিন), ডুবরাজ, পানিধান, নারায়ণকামিনী, পানিকলস, সোলে	ঐ, ১০-১২ ফুট খড় হয়, কেরালা সুন্দরী পুরুলিয়ার একটি জাত, কেরালার নয়, অনেক দেশী ধান জলসহ্য করতে পারে
৪	১-২ ফুট জলে হবে	সবিতা, পাটনাই, নারায়ণকামিনী, জলকামিনী, তিলককাছারী, কুমড়াগোড়, লালজাবড়া, লীলাবতী, মালাবতী, মরিচশাল, মৌল, নাগরাশাল, পানিডুবা, কবিরাজশাল, ঘিওস, অগ্নিবান, বাঁশগজাল, হড়মানোনা, মেঘি	বেশির ভাগ মোটা চাল, মুড়ি ভাল হয়, মাছও হয়, এক বিঘা ধান জমি থেকে কমপক্ষে ১০০০ টাকার মাছ পাওয়া যায়। এখন সার ও বিষের জন্য তা হয় না।
৫	লবণ সহনশীল	তালমুণ্ডর, নোনাবোখরা, নোনাকাটি, সাদা ও লালগেতু, হোগলা, এস অঅর ২৬বি, ক্যানিং ৭, মরিচশাল, নোনাশাল, কামিনীভোগ, খেজুরছড়ি, দুধেশ্বর (সামান্য লবণাক্ত জায়গা)	সুন্দরবন অঞ্চল। উপরিউক্ত প্রান্তিক জমি ও লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য আধুনিক জাতের ধান এখনো বের হয় নি।
৬	মাঝারি জমির জন্য	কেরালাসুন্দরী, বহুরূপী, কেশবলাল, বউরাণী, অসিতকলমা, ভাসামানিক, কলমা	মোটা চাল, বিঘায় ১৪-১৭ মণ ফলন, খড়ের দাম ভাল, শুধু মাত্র জৈব সার দিয়ে
৭	মাঝারি জমির জন্য	চামরমণি, দুধেশ্বর, বলরামশাল, ঝিঙেশাল, কবিরাজশাল, রূপশাল, কাটারিভোগ, লঘু পাকড়ি, সীতাশাল, বাঁশকাঠি (বাজারের নয়)	সরু চাল, সুস্বাদু, ৯-১৩ মণ বিঘায়, খড়ের দাম ভাল
৮	আউশ ধান	বাঁশগজাল, কেলেবোরো, পরি, যাটিয়া	অনেক চালের খোসার রং লাল, ভিটামিন ও লোহা সমৃদ্ধ, পুষ্টিকর
৯	দেশী বোরো ধান	লাঠিশাল, গুলিগাঁটি, লালবোরো, কালোবোরো, দুধেশ্বর	অনেক চাল লাল, ধানের সঙ্গে মাছ চাষ, এক কালি করে চারা লাগানো হচ্ছে প্রায় ২০০ বছর ধরে (কালোবোরো)।
১০	সুগন্ধী ধান	কালোনুনিয়া, লালবাদশা ভোগ, গোবিন্দভোগ, রাধাতিলক, তুলসিমুকুল, তুলসি মঞ্জরী, কালোজিরা, চিনি আতপ, তুলাইপাঞ্জি	ছোট সরু, সামান্য মোটা, পায়েসের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।
১১	বন্যার পর দেরীতে লাগানোর ধান	কামিনীভোগ, হোগলা, গানজিয়া (বাংলাদেশ)	আশ্বিন মাসে ধান লাগিয়ে পৌষ মাসে কাটা হয়
১২	প্রথমে খরা পরে বন্যা সহনশীল	গামরাহ (বিহার)	কোশী নদীর কূলে চাষ হত
১৩	মিশ্র ফসল হিসাবে ধান	বীরপানা ও বেনাঝুপি	দুটি ধান একসাথে ছিটিয়ে বোনা হয় একমাস আগে পরে কাটা হয়
১৪	ঠাণ্ডা জলে ভাত	কোমল (অঘনিবোরা)	অসমের জ্বালানি সাশ্রয়কারী ধান ২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখলেই ভাত
১৫	১০০ পাশকাঠি যুক্ত ও ৮-১০ ফুট লম্বা ধান	মেলহিটে (বিস্ময়কর ধান)	নাগাল্যান্ডের ধাপ চাষের এই ধানের পাশকাঠি হয় ১০০-১৫০টি, এক কালি করে লাগানো হয়। এখনকার *শ্রী* পদ্ধতির অনেক আগে থেকেই চালু আছে। ফলন বেশি।
১৬	খিচুড়ির চাল	বাঁশফুল (সুগন্ধি)	খিচুড়ি রান্নার সময় চালটি লম্বালম্বিভাবে ভেঙে যায় (বরিশাল)
১৭	মধ্য মেয়াদী ধান	পারা, কেলাস, দেরাদুন, গন্ধেশ্বরী, ডুবরাজ, তুলসা, কেরালা সুন্দরী	কিছু দেশী ধান স্বল্পমেয়াদী (৮০ দিন), স্বদেশী ধান শুয়ে পড়ে না

দেশী ধান আমাদের জাতীয় সম্পদ—একে রক্ষা করার দায় আমাদের সকলের।

পিঙ্কি বিতর্ক ও গোপনীয়তার অধিকার

শাশ্বতী ঘোষ

খেলোয়াড় পিঙ্কি প্রামাণিককে আমরা সবাই এতদিন 'সোনার মেয়ে' বলে জানতাম, কারণ সে অন্যান্য নানাজাতীয় খেলার সঙ্গে ২০০৬ সালে দোহার এশিয়ান গেমস্ আর সেই বছরেই কমনওয়েলথ্ গেমসে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে যথাক্রমে সোনা আর রূপো জিতেছিল। তার খেলার রেকর্ডের জন্য আঠারো বছর বয়স হবার আগেই রেলে চাকরি পেয়েছে। ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিতে গিয়েও পেশির সমস্যার কারণে সে শেষ পর্যন্ত যেতে পারে নি। আজ তিন বছর হলো সে খেলা ছেড়ে দিয়েছে, এবার তার তিন বছরের একত্রবাসের সঙ্গিনী তার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছে, পিঙ্কি মেয়ে নয়, ছেলে এবং পিঙ্কি তাঁকে দীর্ঘদিন ধর্ষণ করে আসছে। তার চাকরিদাতা রেল তাকে সাসপেন্ড করেছে, বলেছে সে মেয়ে বলে প্রমাণিত হলে চাকরি ফিরে পাবে।

নারী-পুরুষের ধোঁয়াশা

এ পর্যন্ত তিনবার তার লিঙ্গ পরীক্ষা হয়েছে, প্রথমে হয়েছে বারাসতের একটি নার্সিং হোমে, যেখানে তাকে একজন ডাক্তার দেখেন এবং সেখানে বলা হয়েছিল সে ছেলে। তারপর বারাসাত জেলা হাসপাতালের সাতজন ডাক্তারের বোর্ড, এবং তারপরে আবার এস এস কে এম বা পিজি হাসপাতালের এগারো জন ডাক্তারের বোর্ড, এ পর্যন্ত মোট আঠারোজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এখনো আসতে পারেন নি যে সে ছেলে না মেয়ে। তাঁরা বলেছেন পিঙ্কির রক্ত ক্রোমোজম পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে হায়দ্রাবাদ বা মুম্বাইতে, কারণ সে পরীক্ষার ব্যবস্থা তাঁদের হাতের মধ্যে নেই।

পিঙ্কি মেয়ে না ছেলে, এ প্রশ্ন সে যতদিন খেলেছে, দেশকে মেডেল এনে দিয়েছে ততদিন ওঠে নি। তাহলে এখন উঠছে কেন? পিঙ্কির ও পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে প্রত্যন্ত বাঘমুণ্ডিতে থাকা পরিবারের মতে সে মেয়ে। মা পুষ্প ও বাবা দুর্গাচরণ প্রামাণিক বারবার বলেছেন তাকে তাঁরা মেয়ে হিসাবেই বড় করেছেন, তবে সে দৌড়োতে ভালোবাসে, ছেলেদের সঙ্গে টইটই করে ঘুরে বেড়ানো ডানপিটে মেয়ে। কিন্তু পুলিশ যখন তাকে গা ঘেঁষে চেপে বসে গাড়িতে করে নিয়ে যায়, বা তার ট্রলি-ঠেলা হাসপাতালের অধস্তন কর্মীরা যখন মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'আরে পিঙ্কি, তুমি মেয়ে না ছেলে', তখন মনে হয়, পিঙ্কি মেয়ে, তার পদবি প্রামাণিক, তার বাড়ি পুরুলিয়ার

বাঘমুণ্ডিতে, তার পাশে নেই লেখাপড়া-জানা অভিভাবকদের সোচ্চার উপস্থিতি যারা তাকে আগলে রাখবেন, তাই পুলিশ আর মাইনে-করা ট্রলিটালকের এতো সাহস হয় তাকে অপমান করার। *আম জনতা, বিশেষত তাকে দেখতে ভিড় করে আসা মজা-লোটা বেকার পুরুষমানুষরা মনে না রাখলেও আধিকারিক আর কর্মচারীরা কেন মনে রাখবেন না যে মেয়ে নয় বলে প্রমাণিত না হওয়া অবধি সে মেয়ে, আর আমাদের সংবিধান অভিযুক্ত হলেও সমস্ত নাগরিকদের দিয়েছে কিছু অধিকার আর বিশেষত মেয়েদের দিয়েছে আরো বাড়তি কিছু অধিকার*। এমন কি অভিযোগ প্রমাণিত হলেও তার শরীর অশোভনভাবে স্পর্শ করার অধিকার কারুর নেই।

পিঙ্কি বারাসাতের সেই বেসরকারি নার্সিং হোমটির ফর্মে সই করতে অস্বীকার করে খবর হয়েছিল, সে বলেছিল সে সারাজীবন বহুবার লিঙ্গ পরীক্ষা দিয়েছে, তাই আর তার নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার যখন আঠারো জন ডাক্তার ফেল হয়ে গেলেন, এবার বারাসাতের নার্সিং হোমের লাইসেন্স (যদি থাকে!!) বাতিল হবে? নারী-পুরুষ চিনতে এখনো বাকি আছে বলে বাতিল হবে সেই চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন? আসলে এখন বিজ্ঞান বলছে, নারী-পুরুষ চেনা ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কঠিন। কারণ ভ্রূণ প্রথম যখন মাতৃগর্ভে জন্মায়, তখন তা মায়ের এক্স ক্রোমাজেম নিয়ে জন্মায়, এরপর বাবার থেকে এক্স ক্রোমোজম পেলে সে হবে মেয়ে, আর ওয়াই পেলে ছেলে (ছেলে = এক্স-ওয়াই, মেয়ে

= এক্স-এক্স)। সমস্যা বাধায় প্রকৃতি, কেউ কেউ জন্মায় এক্স-ওয়াই-এক্স-ওয়াই হয়ে, কেউ এক্স-এক্স-ওয়াই, কেউ এক্স-ওয়াই-ওয়াই হয়ে। যৌনাঙ্গের বিচারে হয়তো আপাতদৃষ্টিতে কারুর পুরুষের মতো যৌনাঙ্গ, ভিতরে হয়তো রয়ে গেছে মেয়েদের যৌনাঙ্গের অবশেষ বা অপূর্ণ নারী জননাঙ্গ, বিপরীত ঘটতে পারে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রেও। এরকম বহু মানুষ, নারী ও পুরুষ তাঁদের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য না জেনেই জীবন কাটিয়ে দেন, আবার বহু মানুষ সারা জীবন নিজেদের নিয়ে অশান্তি আর ধাঁধায় কাটান, যেহেতু জন্মবেলায় পরিবার, দাই-মা বা বারাসাতের নার্সিং হোমের ডাক্তারের মতো কারুর হাতে প্রসব হয়ে থাকলে তাঁর ফরমানে এরকম আলো-আঁধারি মানুষরা ভুল লিঙ্গ চিহ্নে জীবন কাটাতে বাধ্য হন। পিঙ্কি হয়তো সেই আলো-আঁধারি মানুষদের দলেই, তাই আঠারো জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফেল হয়ে গেছেন সে নারী না পুরুষ, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে! তবে এটাও এক ধরনের মোটা দাগের কথা, সেই আপাতদৃষ্টিতে মনে-হওয়া নারী বা পুরুষটি তার পরিবার আর চারপাশ থেকে কতটা সহায়তা বা বিরূপতা পাবে তার ওপর নির্ভর করবে সে উভলিঙ্গ, মেয়েলি পুরুষ বা পুরুষালি মেয়ে হয়ে বড় হতে পারবে কিনা। সমাজের আর পরিবারের অনুশাসন যদি তার ওপর চেপে বসে, তাহলে সে যা হতে চায়, তা কখনোই হয়ে উঠতে পারবে না।

ভালো খেলোয়াড় মানে মেয়ে নয়?

খেলাধূলার ক্ষেত্রে ছেলেদের শারীরিক শক্তি মেয়েদের থেকে বেশি, তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপের ছেলে খেলোয়াড়রা মেয়ে সেজে অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে আর আন্তর্জাতিক নানা খেলায় এসে পদক নিয়ে যাচ্ছে, এই সন্দেহ থেকে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমি দেশগুলোতে বাধ্যতামূলক হয়ে যায় মেয়ে খেলোয়াড়দের শারীরিক পরীক্ষা। ১৯৬৮ সালের শীতকালীন অলিম্পিক থেকে অলিম্পিকেও তা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এর জেরে যেমন পোলিশ দৌড়বাজ ইভা ক্লোবুকোস্কা, যিনি টোকিও অলিম্পিকে ১৯৬৪ সালে সোনা জিতেছিলেন, তারপর আর খেলার অনুমতি পান নি। কিন্তু এই পরীক্ষা শুধুমাত্র মেয়েদের দিতে হয়, তা বৈষম্যমূলক, আর তা ছাড়া সেই পরীক্ষা অনেক সময় কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না, কারণ বিষয়টায় ধোঁয়াশা অনেক, তা মেয়েটিকে এমন বিপরীত প্রচারে আনে যাতে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, এরকম নানা কারণে ১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিকের পর থেকে বাধ্যতামূলক লিঙ্গপরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন শুধুমাত্র বিতর্ক উঠলে তবে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার চমকসৃষ্টিকারী দৌড়বাজ মেয়ে কাস্টার সেমেনিয়া ২০০৯ সালের বার্লিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮০০ মিটারে রেকর্ড সময়ে দৌড়োলে তার লিঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই পরীক্ষা হয় জার্মানিতে, তাকে পরবর্তী সময়ে খেলতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার লিঙ্গপরীক্ষার ফল জনসমক্ষে আনা হয় নি। যেমন ভারতের এশিয়ান গেমসে আরেক পদকপ্রাপ্ত শান্তি সৌন্দরাজন ২০০৬ সালের দোহা এশিয়ান গেমসে ৮০০ মিটারে রূপোর পদক পাওয়ার পর সে নারী নয় বলে 'প্রমাণিত' হলে তার পদক কেড়ে নেওয়া হয়, সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

পিঙ্কি বারাসাতের নার্সিং হোমের শারীরিক পরীক্ষার ছবিও নাকি লোকেদের মোবাইলে ঘুরছে, সেও নাকি পুলিশদের দৌলতে। সরকার তাকে চাকরি দিয়েছে বলে পিঙ্কির শরীর আজ সরকারের সম্পত্তি, অথচ আমাদের সংবিধান আমাদের শরীরের, গোপনীয়তার অধিকার-ও আমাদের নাগরিকদের দিয়েছে। পিঙ্কি দেশকে গৌরব এনে দিয়েছিল যখন, তখন তার নারীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে নি, আজ খেলার জীবনে অবসর নিয়ে যদি সে পুরুষ-ও হয়ে যেতে চায়, তার জীবনের সেই আগের পর্বটুকু তো মিথ্যে হয়ে যায় না। তাহলে আমরা পিঙ্কিকে সেই গোপনীয়তার অধিকারটুকু কেন দেবো না?

পিঙ্কি তার সাথিকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করলে আইন আইনের পথে চলুক, সে শাস্তি পাক। কিন্তু পিঙ্কির হেনস্থা হয়ে থাকলে, তার সাথি, এবং তাকে শারীরিক ও কটু কথায় হেনস্থা করলো যারা—সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, পুলিশ, হাসপাতালের কর্মীটি, সবাই কেন শাস্তি পাবে না? কেন তাকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হবে? স্বামীর অকালমৃত্যুতে তাঁর জায়গায় সহানুভূতির সুবাদে স্ত্রী চাকরি পেলে কি সেই বিধবা স্ত্রীর পুনর্বিবাহের অধিকার বরবাদ হয়ে যায়? তাহলে মেয়ে খেলোয়াড় হিসাবে চাকরি পেয়ে থাকলেও আজ যদি তিনি খেলোয়াড় জীবনের শেষে ছেলে বলে প্রমাণিত হন, তাহলে কেন তাকে চাকরি খোয়াতে হবে?

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস্ বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার নম্বর: ৯৮৩০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

রুশদি এবং ভারতরাষ্ট্রের নতুন ধর্মতন্ত্র

প্রবীণ স্বামী

[মূল ইংরেজি রচনাটি Salman Rushdie and India's new theocracy প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায়, ২১ জানুয়ারি ২০১২। এখানে তার সংক্ষেপিত সারানুবাদ করা হয়েছে। বাঙলা রচনাটি কোনো অর্থেই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। — **ভাষান্তর : প্রদীপ রায়**]

জয়পুর সাহিত্য-উৎসবে সলমন রুশদির যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসে একটি প্রস্তরফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভারতে রাষ্ট্রের সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) গাঁথনিটি যে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তারই স্মারক এই ঘটনাটি। ইসলামবাদী যাজকরা প্রথমে ভারত-রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যে, রুশদির ভারতে আসা বন্ধ করতে হবে; তারপর তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় যাতে তিনি ভয় পেয়ে যান। ভয় ব্যাপারটাই সেন্সর করার পক্ষে খুব কার্যকরী। দুজন লেখক---হরি কুনজরু আর অমিতাভ কুমার—রুশদির প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে তাঁর 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' বই থেকে কিছু অংশ পাঠ করতে চেয়েছিলেন। সেটাও উৎসবের উদ্যোক্তারা তাঁদের করতে দিলেন না।

১৯৮৯ সালে রুশদির বিরুদ্ধে প্রথম প্রচার শুরু করেন আহমদ দিদাত (Ahmed Deedat) নামে এক ক্ষমতাশালী নয়া-মৌলবাদী ব্যক্তি। সেই সময় একটি প্রবন্ধে তিনি এই আশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন যে, রুশদির যেন প্রতিদিন শতবার করে কাপুরুষের মতো মৃত্যু হয় আর যখন সত্যিই মৃত্যু তাকে গ্রাস করবে, সে যেন নরকের কটাহে চিরকাল ফুটতে থাকে। তিনি ওই বইটিকে নিষিদ্ধ করার 'সুবিবেচনাপূর্ণ' সিদ্ধান্তের জন্য রাজীব গান্ধিকে ধন্যবাদ জানান। এবার ভারতের আরেকজন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ওই ব্যক্তিটির আশাপূরণের পথকে প্রশস্ত করে তুলতে।

জয়পুরে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে যেভাবে প্রতারণা করা হলো, সেটা আরও বড়ো একটা অঙ্গীকারভঙ্গের অংশমাত্র। মুসলিম ধর্মনেতাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনাটা হলো এই যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরকে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত করেছে।

মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে রাষ্ট্র কী ধরনের ভরতুকির রাজনীতি করে, তা বেশির ভাগ ভারতীয়ই হয়তো জানেন না। মহাকুম্ভমেলা এর একটা খুব বড়ো উদাহরণ। বারো বছর অন্তর-অন্তর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় হরিদ্বার, এলাহাবাদ, উজ্জয়িনী এবং নাসিক-এ। ২০০1 সালে এলাহাবাদে কুম্ভমেলার পর জন দয়াল (John Dayal) একটা হিসেব দিয়েছিলেন যে, এই মেলার জন্যে সরকার খরচ করেছিল ১০০০ মিলিয়ন টাকারও বেশি। ৫০ মিলিয়ন পানীয় জল জোগান দেওয়ার জন্যে ১২ হাজার কল বসাতে হয়েছে; ৪৫০ কিমি পথ জুড়ে ইলেকট্রিক লাইন বসানো হয়েছে, ১৫ হাজার আলো বসানো হয়েছে রাস্তায়। এ ছাড়া তৈরি করতে হয়েছে ৭০ হাজার শৌচাগার; ১১টি পোস্ট অফিস, ৩০০০ ফোনের লাইন; জোগান দিতে হয়েছে ৪০০০ হাজার বাস এবং ট্রেন। কাজে লাগাতে হয়েছে ৭ হাজারেরও বেশি সাফাইকর্মী। এই যে খরচের হিসেব দেওয়া হলো,   ...হক্টর জমির ভাড়া এবং মেলা ... শত-শত সরকারি কর্মী, তাদের ...।

...র দাবি করেছে যে, ২০১৩ সালে ...রিচালনার জন্যে আড়াই হাজার ...তাদের দিতে হবে; কারণ মেলার ...টার লাগবে; আরো নানা আধুনিক ...কর্মী দরকার হবে ৩০ হাজারের ...রিকাঠামো তৈরির জন্যে সরকার কত কোটি টাকা খরচ করবে, তার পুরো হিসেব কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই বছর এনকেফেলাইটিস মহামারীতে ৫০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং ওই রোগ নিবারণের জন্যে সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে মাত্র ০.২৮ বিলিয়ন টাকা।

কুম্ভমেলার জন্যে সরকার যে-ভরতুকি দেয়, তা কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম নয়। যে-মুসলমানরা হজ করতে যান, তাঁরাও সরকারি সাহায্য পান। বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত ঐতিহাসিক ধর্মস্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য শিখদেরও সরকারি কোষাগার থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। হিন্দুরা এই ধরনের সাহায্য পান আরো

বেশি পরিমাণে। অমরনাথ থেকে কৈলাস মানসসরোবর—বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণের জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে রাষ্ট্র। জ্যোতিষের মতো ভুয়ো-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যেও তারা টাকা দেয়। ২০০১ সালে গুজরাত সরকার মন্দিরের পুরোহিতদেরও বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

২০০৬ সালে এক বিরল ঘোষণায় সরকারপক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছিল, বাজেটের একটা অংশ নির্দিষ্ট থাকে 'ধর্মীয় পরিষেবার' খাতে প্রাচীন ধর্মস্থানগুলোর সংস্কার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য, গুরু নানক জয়ন্তী বা দশেরার মতো উৎসব পরিচালনা ইত্যাদির নামে যা অর্থব্যয় হয়, তা সবই ধর্মীয় পরিষেবা।

ঠিক কত টাকা খরচ করা হয় তার হিসেব অবশ্য পাওয়া যায় নি। তবে এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমশই বাড়ছে। ২০০৩-৪ সালে যা ছিল ৫২৬ মিলিয়ন টাকা, ২০০৬-৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭৫১ মিলিয়ন। এই ব্যয়বরাদ্দ ছিল ওই বছর সরকারি বাজেটের ০.৭৪ শতাংশ—পরিবেশ সংরক্ষণ, খনিশিল্প পরিচালনা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশি।

রাষ্ট্র ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সব ধর্মের নেতারাই রাষ্ট্র বিরোধী হয়ে পড়েন। ভারতরাষ্ট্র তাই বিশ্বাসভিত্তিক আইন, ব্যক্তিগত আইন ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিফল হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ওই নেতাদের কাছে প্রশংসনীয়। রাষ্ট্রই আমাদের বলে দেয়, সলমন রুশদির ওই বইটা না পড়লেও চলবে। ডি. এন. ঝা-র 'হোলি কাউ' নামে অনবদ্য বইটা যারা বিক্রি করছে, তাদের ওপর হামলা হলে রাষ্ট্র ওই হামলাবাজদের কোন ভাষ্য বা শিবাজীর কোন জীবনীটা আমরা পড়ব না —সেই বিষয়েও নির্দেশ আসে রাষ্ট্রের কাছ থেকে। [এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে।] ...

এ-সবই হলো ঈশ্বরের নামে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। আমরা কী খাব আর কী খাব না—তাই নিয়েও রাষ্ট্রের নির্দেশ আসে। গো-মাংসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সংখ্যা বাড়ছে। তথাকথিত পবিত্র ধর্মস্থানে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সরকারি অর্থসাহায্যে যে-বিদ্যালয় চলছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যেন প্রতিদিন প্রার্থনাসভায় যোগ দেয়—সেই নির্দেশ আছে। রাষ্ট্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্যে টাকা দেয়, সরকারি অনুষ্ঠানের সূচনায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, জ্যোতিষের মতো ভুয়োবিজ্ঞান চর্চায় অর্থ ব্যয় করে; আর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এম. এফ হুসেন বা সলমন রুশদির মতো ধর্মবিদ্রোহীদের ওপর।

এমনকী আইন প্রয়োগের ভারও অনেক সময় চলে যায় ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের হাতে। সম্প্রতি কাশ্মীরে এক স্বনিযুক্ত সরিয়া আদালত নির্দেশ দিয়েছে, খ্রীস্টান পুরোহিতদের বিতাড়িত করতে হবে জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে। পুলিশ-প্রশাসন-আদালত—কেউই এর বিরোধিতা করেনি। উত্তর ভারতের বহু রাজ্যে স্থানীয় জাতভিত্তিক স্বৈরাচারী সংগঠনগুলো ধর্মীয় প্রথা লঙ্ঘনের অপরাধে নির্মমভাবে শাস্তি দেয় মানুষকে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর হিসাবে, ২০১০ সালে ১৭৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে ডাইনিবিদ্যা চর্চার অপরাধে।

কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে, ভারতে উদারপন্থীরা ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসের ব্যাপারটা থেকে সরে গিয়ে সহিষ্ণুতার তত্ত্ব প্রচার করে যাচ্ছেন। ২০০৫ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর একটা কমিটি তৈরি করেছিল যার কাজ হবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি কীভাবে সহিষ্ণুতার তত্ত্ব প্রচার করতে পারে, তা বিবেচনা করে দেখা। লিঙ্গদেভারু হ্যালেমানে (Halemane) নামে এক ভাষাবিদ এবং নাট্যকার পরিষ্কার ভাষায় বলেন, কমিটি একটা উন্মাদ কল্পনার পিছনে ছুটছে। তাঁর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য: যে-অঞ্চলে যে-ধর্মের প্রতিপত্তি, সেই অঞ্চলে তারাই স্কুল খুলবে এবং প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে স্থানীয় প্রথাপরম্পরা।

ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যে সহিষ্ণুতার স্থান কতটা—সেই প্রশ্ন না হয় এখানে থাকে। সাম্প্রদায়িক হিংসায় আক্রান্ত হাজার-হাজার মানুষই তার জবাব দেবেন। আমাদের ভুয়ো ধর্মনিরপেক্ষতা কার্যত সাম্প্রদায়িক ভেদরেখাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক আকার দেওয়ার কাজটাই করেছে। এই রাষ্ট্র ধর্মনেতাদের সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার অধিকার দিয়েছে এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিজগৎ থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখার অধিকার পেয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ধর্মনির্বিশেষে ভারতের জনসাধারণ কিন্তু রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে দাবি তোলে না। ভারতের গরিব মানুষ তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠান এই আশায় যে, তারা ভাষা শিখবে, বিজ্ঞান শিখবে। প্রার্থনা শিখছে কিনা, তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। ভারতে রাজনৈতিক বিষয়গুলো স্থির হয় ইহজগতের দাবি নিয়েই। মসজিদের গম্বুজটা সারাতে হবে বা মন্দিরের গায়ে খোদাই-করা হাতিটা মেরামত করতে হবে—এইরকম দাবি নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দলই অর্থসাহায্যের জন্যে প্রচার করে না।

আজ থেকে আট বছর আগে গবেষক মীরা নন্দা যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, ভারতে জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটি থেকে ধর্মের ভূমিকা কমিয়ে আনতে হবে যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে-প্রতিশ্রুতি সংবিধানে দেওয়া হয়েছে, তাকে বাস্তবে রূপায়ণ করা যায়। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেছিলেন, যে, ভারত আসলে এটা মোটেই চায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিরক্ষায় ব্যর্থতার পরিণামী ফলগুলিও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। জাতবৈষম্য এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য—এইরকম দুটি পরিণাম। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিবোধ এবং

বিচারাত্মক (ক্রিটিক্যাল) চিন্তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে; আর ক্রমশ স্ফীত হয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ।

এই যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তাকে কিছুতেই পূরণ করা যাবে না যদি না সামাজিক জীবন থেকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কোনো বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বলবেন না যে, আট বছরের একটি শিশু যদি আবিষ্কার করতে পারে যে, পরি বলে কিছু নেই, তাহলে স্কুলের উচিত তাকে সেই কাজে নিরুৎসাহিত করা। ঠিক তেমনি কেউই নিশ্চয় বলবেন না যে বানরসেনারা সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করেছিল—এই ধারণাটা শিশুদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কোনো বিরাট উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। একজন ব্যক্তি মনে করতেই পারেন যে, গো-মূত্র দিয়ে ক্যানসার রোগ সারানো যায়; কিন্তু রাষ্ট্র নিশ্চয় এই উদ্ভট কল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা করবে না।

১৯২৭ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছিলেন: ঈশ্বরবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত একটা অর্থহীন দাবিতেই গিয়ে দাঁড়ায়। তা হলো: আমার দিকে তাকাও। এমন সুন্দর সৃষ্টি আমি, এর পিছনে নিশ্চয় বিশ্বভুবনের একটা ডিজাইন আছে।

ভারতে যারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষ থেকে আজ এই দাবি করার সময় এসেছে যে আমরা একটা উন্নততর পৃথিবী চাই। যে-পৃথিবীতে স্বীকৃত হবে নাগরিকত্ব এবং তার অধিকার। রাষ্ট্র এবং তার দোসররা আত্মপরিচয়ের যে ক্ষতিকর রাজনীতি নিয়ে প্রচার করে, সেই রাজনীতি নয়। **উমা**

এ পরবাসে রবে কে...

মোহিত রণদীপ

পানুবাবু বছর পাঁচেক আগেও হৃদয়পুরে থাকতেন। সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন। পাড়ার রামুদার চা-এর দোকানে সেই সময় প্রৌঢ় পানুবাবু ছাড়াও জড়ো হতেন বয়স্ক আরও অনেকেই। চলতো জমজমাট অধিবেশন। সেই অধিবেশনের বিষয় হত, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, গাভাস্কার-শচীন, স্বর্ণযুগের বাংলা গান-জীবনমুখী, সি পি এম-তৃণমূল, মূল্যবৃদ্ধি, আমেরিকার দাদাগিরি ...আরও অনেক কিছুই। ন'টা বাজতেই পানুবাবু বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিতেন। সান্ধ্য অধিবেশনে যোগ দিত কমবয়সী অনেকেই। এই সময় বয়স্কদের সংখ্যা কমে গেলেও পানুবাবু থেকে যেতেন তখনও 'পানুদা' হয়ে। শুরু হত তাসের আড্ডা। 'সেন্স অব হিউমার' পানুদাকে করে তুলেছিল জনপ্রিয়। সবার সঙ্গেই আড্ডায় তিনি সাবলীল।

সেই পানুদা একদিন স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন 'স্পেসটাউন'-এর গগনচুম্বি আধুনিক একটি অট্টালিকার ফ্ল্যাট-এ। তথ্যপ্রযুক্তি-পড়া ছেলে ব্যাঙ্গালোরে চাকরিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরেই হৃদয়পুরের পুরোনো বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কেনে এই নতুন ফ্ল্যাটটি। তখন থেকেই পানুদা-র স্থায়ী ঠিকানা এটাই। পানুদা এখানে হয়ে যান প্রাণতোষবাবু। বছর দুই হল বিয়ে হয়ে গেছে কন্যার। গত বছর স্ত্রী-ও চলে গেলেন ক্যান্সারে। এখানো কোনো রামুদার চায়ের দোকান নেই। এখানে বসে না কোনো অধিবেশন। প্রাণতোষবাবু সকালে চা আর খবরের কাগজ নিয়ে গ্রিল-ঘেরা বারান্দায় এসে বসেন। আর, উদাস চোখে চেয়ে থাকেন দূরে।

কারো জীবনে অপ্রত্যাশিত বিপন্নতা। বিশেষ করে এই বিপন্নতা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাণতোষবাবুর মতো যাঁরা বয়স্ক, তাঁদের ক্ষেত্রে।

এক দেশ থেকে আর এক দেশে মাইগ্রেশানের কথা আমরা জানি। আমাদের এই মাতৃভূমিতে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন। '৪৭-এ দেশ ভাগের পর্বে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পর্বে ওপার বাংলা থেকে বহু মানুষ এপারে এসেছেন, আবার এপার থেকেও চলে গেছেন বহু মানুষ। ভিটেমাটি ছেড়ে, সর্বস্ব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া এই মানুষেরা হারিয়েছেন তাঁদের জন্মভূমি, হারিয়েছেন অনেকেই তাঁদের আত্মপরিচয়। প্রয়াত গল্পকার জ্যোৎস্নাময় ঘোষ-এর লেখা গল্পের এক চরিত্র এপারে নিজস্ব বাড়ি করার কথা ভাবতে পারেন নি। ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসার পর ধীরে ধীরে থিতু হয়েছিলেন, সরকারি চাকরি এনে দিয়েছিল কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যও। কিন্তু, ভাড়া করা বাসাতেই কেটেছে জীবন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এই পরবাসে নিজস্ব বাড়ি করার কথা ভাবতে পারেন নি, পারেন নি ওপারের পিতৃপুরুষের বসতভিটে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নিতে। ওপার বাংলাই তাঁর কাছে স্বদেশভূমি, এপার তাঁর মননে পরবাসই থেকে গেছে। ঘর-বসত ছেড়ে দেশান্তরে যাবার যে যন্ত্রণা—তা অনেকের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আবার অনেকে পরবর্তীকালে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার মাধ্যমে হয়তো অনুভব করেছেন।

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিযান বা মাইগ্রেশন —এ-ও এক দীর্ঘকালের বাস্তবতা। একটু ভালো থাকার জন্য কিংবা জীবন-জীবিকার জন্য এই পরিযান আমাদের দেশে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে নিয়ত ঘটে চলেছে।

অর্থনীতির পঠনপাঠনে যাঁরা যুক্ত তাঁরা মাইগ্রেশনে পুশ ফ্যাক্টর এবং পুল ফ্যাক্টর-এর কথা বলেন। কারণ যাই থাকুক, মাইগ্রেশন-এর প্রভাবে কারও কারও জীবনে নেমে আসে বিপন্নতা। বসতভিটের মাটির সঙ্গে যে নাড়ির টান, তা ছিন্ন হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানুষ তার নিজস্ব সমাজ আর সংস্কৃতি থেকে, নিরাপত্তাবোধের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে, সংকটাপন্ন হয় আত্মপরিচয়।

সাম্প্রতিকালে নীরবে ঘটে চলেছে বিপুল সংখ্যক মানুষের মাইগ্রেশন। এক দেশ থেকে আর এক দেশে নয়, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে নয়—একই রাজ্যের মধ্যে, এমনকি অল্প ভৌগোলিক দূরত্বের মধ্যেই ঘটে চলেছে এই পরিযান বা মাইগ্রেশন। মূলত পারিবারিক-আর্থিক-সামাজিক কারণেই এই মাইগ্রেশন। যা বহুক্ষেত্রেই হয়তো অনিবার্য। নতুন ধরনের এই মাইগ্রেশনেও অনেকের জীবনে নেমে আসছে বিপন্নতা। আমাদের প্রাণতোষবাবু এমনই এক বিপন্নতার শিকার। একটি চারা গাছকে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় সহজেই। নতুন মাটি, নতুন জলবায়ু, নতুন পরিবেশের সঙ্গে সে মানিয়ে নিতে পারে তুলনামূলক সহজে। কিন্তু, একটি মহীরূহকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তর সহজ নয়। ঠিক তেমনি একজন বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে পরিযান বা মাইগ্রেশন অনেক ক্ষেত্রেই বিপন্নতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের এই আলোচনা মাইগ্রেশন প্রভাবিত সেই সব বয়স্ক মানুষদের নিয়েই।

সাম্প্রতিককালে গড়ে ওঠা নগর-উপনগরে এ রকম অনেক মানুষকে পাবো যাঁরা সেখানে খুব স্বস্তিবোধ করেন না। পরিযান বা মাইগ্রেশন-এর প্রভাব সবার ওপরে একইভাবে পড়ে এমন নয়। বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে দিব্যি মানিয়ে নিতে পারছেন। কেউ কেউ সাময়িকভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হচ্ছেন, পরে আবার ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারছেন এ সব সমস্যা। কিন্তু, বয়স্কদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আক্ষরিকভাবেই বিপন্ন বোধ করছেন। একাকিত্বে ভুগছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক, তাঁর সাম্প্রতিক একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ রাস্তায় পায়চারি করছেন আর একা একাই বেশ জোরে জোরে একই কথা বারবার বলে চলেছেন, 'এই সল্টলেক খুবই ভালো, এখানকার মানুষজনও খুউব ভদ্রলোক, কিন্তু, তাই বলে একটু জানতেও চাইবে না, নতুন লোকটা কে? কেমন? চোর-জোচ্চোর কি না! কেউ কিচ্ছু জানতে চায় না!' অধ্যাপক মশাই সেই বৃদ্ধের একাকিত্ব এবং অভিমানকে বুঝতে পেরেছিলেন। বাড়িতে ডেকে নিয়ে আলাপ-আপ্যায়ন করেছিলেন।

তুলনামূলকভাবে কমবয়সীদের মনে পরিযানের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না এমনটা নয়। কিন্তু, ধীরে ধীরে তাঁরা পরিবর্তিত পরিবেশ-প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। অল্প কয়েকজনের মনেই হয়তো মাইগ্রেশন-এর ক্ষত থেকে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে বয়সকালকে সমস্যাপ্রবণ বলেই মনে করা হয়। সাধারণভাবেই বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে বয়স্ক মানুষদের একাকিত্ববোধ ও বিষণ্ণতা ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাবও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বয়সকালে তার সঙ্গে রয়েছে স্বজন হারানোর বেদনা, শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি—আর এই শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতির কারণেই বেশিরভাগ সময় তাঁদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। হারাচ্ছেন তাঁদের ইচ্ছেমতো চলাফেরার স্বাধীনতাও। অনেক সময় নিজেকে তাঁদের অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে তাঁদের। এর ফলে কাছের মানুষদের সঙ্গে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা, তৈরি হচ্ছে মনের দূরত্ব।

এই সবগুলোই বয়সকালে ডেকে আনে বিষণ্ণতা। এই বিষণ্ণতার প্রকাশ অনেক সময় শুধু দুঃখের অনুভূতি দিয়ে বোঝা যায় এমনটা নয়। একটুতেই বিরক্তি ও কথায় কথায় রাগও হতে পারে সেই বিষণ্ণতারই প্রকাশ। বিরক্তি, জেদ,রাগ—বয়স্ক মানুষদের মধ্যে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। বিষণ্ণতা ছাড়াও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, নিরাপত্তাহীনতার বোধও বয়স্ক মানুষদের মধ্যে প্রবল মাত্রায় থাকে। বয়সকালে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক অসুখ দেখা যায় যেগুলির সঙ্গে বিষণ্ণতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। হার্টের অসুখ, ক্যান্সার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, পার্কিনসন্‌স ডিজিজ, ডিমেনশিয়া/অ্যালঝাইমার্স প্রভৃতি অসুখে যাঁরা ভোগেন তাঁদের মধ্যে শতকরা কুড়ি থেকে তিরিশ জনের মধ্যে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার দেখা দেয়। বয়স্কদের বিষণ্ণতাকে অনেক সময়ই বাড়ির লোকজন সাময়িক মন খারাপ হিসাবে দেখে থাকেন। এতে অনেক সময় সমস্যা আরও জটিল হয়। বিষণ্ণতা-আক্রান্ত বয়স্ক মানুষটির সঙ্গে অন্যদের দূরত্ব বাড়তে থাকে, তৈরি হয় অ্যাডজাসমেন্ট বা বোঝাপড়ার সমস্যা।

সাধারণ অবস্থাতেই আমরা ওপরের আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি, বয়স্ক-মন সমস্যাপ্রবণ। সেই বয়স্ক মানুষই যখন তাঁর পুরোনো বসত ছেড়ে, ছোটো থেকে বড় হয়ে উঠেছেন যে সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে—সেই পরিমণ্ডল ছেড়ে, অজস্র স্মৃতিচিহ্ন রেখে নতুন একটি পরিবেশে গিয়ে পড়েন তখন খুব সহজেই আগের সব কিছু ভুলে যেতে পারেন তা নয়। বয়স্ক এই মানুষদের অতিসংবেদনশীল হয়ে পড়া মনে দেখা দেয় নিরাপত্তাহীনতার বোধ। কারণ, আগের বসতে বিপদে-আপদে প্রতিবেশীদের সহায়তার দৃশ্যগুলো তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। নতুন পরিবেশে সেই পাড়া-প্রতিবেশী অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত বলা যায়। এই অনুপস্থিতি তাঁদের মনে তৈরি করে নিরাপত্তাহীনতা-অসহায়তা। এই অসহায়তা থেকেই কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে গড়ে ওঠা পিয়ারলেস নগরের একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সত্তরোর্ধ অমরেশ বাবু যোগাযোগ করেন স্থানীয় বিজ্ঞানকর্মী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অমরেশবাবু টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিলেন, 'আমি আর আমার স্ত্রী দু'জনে এখানে থাকি। আমাদের আর কেউ নেই। বিপদে-আপদে আপনাদের সাহায্য পাবো তো?' শুভেন্দু আশ্বস্ত করেছিলেন সেই বৃদ্ধকে। একদিন দেখা করে বেশ কয়েকটি ফোন নম্বরও দিয়ে এসেছিলেন। সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস সত্ত্বেও অমরেশবাবু একদিন এই অসহায়তা থেকেই, এই বিপন্নতার বোধ থেকেই হয়তো শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন নিজেদের। স্ত্রীকে বাঁচানো যায় নি, প্রাণে বেঁচেছেন তিনি। সংশোধনাগার এখন তাঁর ঠিকানা।

সংবাদপত্রে এখন আমরা মাঝেমধ্যেই দেখতে পাই সম্ভ্রান্ত জনপদের কোনো আবাসনে দুর্গন্ধ বেরোনোর পর কোনো নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃতদেহ পুলিশ এসে উদ্ধার করছে।

নাগরিক সমাজে বয়স্ক মানুষদের এই সমস্যা, তাঁদের একাকিত্ব, অসহায়তা নিয়ে সামাজিক উদ্যোগ অল্প কিছু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্যই বলা যায়। কলকাতা পুলিশ-এর পক্ষ থেকে 'প্রণাম' কর্মসূচি তৈরি হয়েছে বয়স্ক অসহায় মানুষদের কথা ভেবেই। কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা এই অসহায়তার বাণিজ্য-মূল্য উপলব্ধি করে ইতিমধ্যেই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে 'বার্ধক্যের বারাণসী' গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে।

কবি যখন আজ আরও 'বেঁধে বেঁধে থাকা'-র কথা বলছেন, তখন আমরা ক্রমশ আরও আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছি, আরও বিচ্ছিন্ন হচ্ছি , আরও একা হয়ে পড়ছি। **উমা**

মোবাইল

উৎস মানুষের সাম্প্রতিক সংখ্যা (এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১২)-য় 'প্রযুক্তি ও বদলে যাওয়া মোবাইল ফোন' নিয়ে ভূপতি চক্রবর্তী-র একটি রচনা পড়লাম। আলোচ্য রচনায় যা আছে তা কম বেশি আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু যা জানি না, মানুষের শরীরের ওপর মোবাইল ফোনের কি কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে? এ ছাড়া জীবজন্তু, উদ্ভিদ তথা প্রাকৃতিক পরিবেশে কি কোনও ক্ষতি হচ্ছে?

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মোবাইল টাওয়ার থেকে বিচ্ছুরিত তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের ফলে চড়াই সহ অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রজাতির পাখিদের আর সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, গত ২৫/৪/১২ তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে চড়াই সহ অন্যান্য পাখীরা পুনরায় ফিরে আসছে। সে ক্ষেত্রে মোবাইল টাওয়ারের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের প্রশ্নে পাখিদের অবলুপ্তির বিষয়টি পরস্পর বিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি দ্বিধান্বিত।

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ফলে মানব দেহের যে শারীরবৃত্তীয় যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কতটা ক্ষতিকর হবে জানা জরুরি।

মোবাইল ফোনের হ্যান্ড সেট জামার পকেট/ প্যান্টের পকেট/ হাত ব্যাগ কোথায় রাখা কম ক্ষতিকারক? শিশুদের ও অন্তসত্ত্বা নারীদের কাছে এই ফোনের ব্যবহার কতটা নিরাপদ বা পেসমেকার বসানো আছে—রোগী কি আদৌ এই ফোন ব্যবহার করতে পারেন? সমগ্র বিষয়টি নিয়ে তথ্য নির্ভর লেখা উৎস মানুষের আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

মোবাইল ফোন: যা রটে, কিছুটা বটে

ভূপতি চক্রবর্তী

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ীর ২৯/০৪/২০১২-র চিঠির প্রসঙ্গে দু-চার কথা জানাই। একে ঠিক চিঠির জবাব বলা যাবে না—লেখক

প্রথমে আসব তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (electromagnetic radiation) প্রসঙ্গে কারণ চিঠির অনেকখানি অংশ জুড়ে প্রসঙ্গটি রয়েছে। আমরা সর্বদাই বাস করছি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মাঝখানে। সূর্য থেকে যে আলো এসে পৌঁছচ্ছে তা হচ্ছে তড়িচ্চুম্বকীয় অঙ্গ। সেই আলোর যে অংশটি আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে তাকে আমরা বলছি দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো। তাছাড়া সৌর বিকিরণে রয়েছে কিছুটা অতিবেগুনী রশ্মি ও অবলোহিত রশ্মি যারা ঐ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের পরিবারভুক্ত। বেতার তরঙ্গ, যার সাহায্যে রেডিওর অনুষ্ঠান হয়। মাইক্রো তরঙ্গ যার সাহায্যে মোবাইল ফোনের কাজ চলে কিংবা এক্স রশ্মি বা গামা রশ্মি সকলেই আদতে একই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শূন্য মাধ্যমে সকলেই চলে আলোর বেগে। পার্থক্য কেবল তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কে। যে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশি তার শক্তিও তত বেশি এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম। এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ। অতিবেগুনী রশ্মির কম্পাঙ্ক দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর তুলনায় কিছু বেশি কিন্তু অবলোহিত, মাইক্রো তরঙ্গ কিংবা বেতার তরঙ্গে কম্পাঙ্ক দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর তুলনায় বেশ কম এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেকখানি বেশি। তাই এগুলির শক্তি তুলনায় বেশ কম।

এক্স রশ্মি বা গামা রশ্মি তাদের শক্তির জন্য অণু বা পরমাণুর ওপর আপতিত হয়ে সেখান থেকে ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিয়ে বার করে আয়ন সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই ধরনের বিকিরণকে বলা হয় আয়ননকারী বিকিরণ বা ionising radiation । প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকোষের ওপর এই বিকিরণ আপতিত হলে তা সেখানকার কোনো অণুকে আয়নে পরিবর্তন করে কোষের ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং তা ক্যান্সার সহ অন্য ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তবে মনে রাখতে হবে যে ক্যান্সারের সম্ভাবনার বিষয়টি একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকেত। কিন্তু কোনো বিকিরণ থেকে অন্য ধরনের অসুস্থতার সম্ভাবনা পরীক্ষার মাধ্যমে (ধারণাগতভাবে নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সেটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অন্যদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো বা তার থেকে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ যার মধ্যে মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত মাইক্রো তরঙ্গও রয়েছে তা কিন্তু এক্স রশ্মি বা গামা রশ্মির মতো কোনো ভূমিকা পালন করে না ফলে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু এ সত্ত্বেও সীতাংশুবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন তা কিন্তু গত পনেরো বছর ধরে বিশ্বের সর্বত্র উঠতে শুরু করেছে মোবাইল ফোনের ব্যবহারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। আর এখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার যে প্রসার লাভ করেছে তাতে প্রশ্নটি কেবল প্রাসঙ্গিক হয় নি। এই প্রশ্নটিকে ঘিরে পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

এই গবেষণায় কয়েকটি বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এবং চিকিৎসকেরা একমত হয়েছেন। প্রথমত, মোবাইল ফোনে ব্যয়িত পাওয়ার বা ক্ষমতা বেশ কম, সর্বোচ্চ মাত্র দু' ওয়াটের মতো। তাই সেখান থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ নির্গত হয় তার পরিমাণ খুব বেশি নয় আর গুণগতভাবে সেই বিকিরণ কম শক্তিশালী তা আগেই বলা হয়েছে। তবে মোবাইল ফোন দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের যে রেওয়াজ রয়েছে তার ফলে কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, যদিও তা ক্যান্সারের মতো ভয়ঙ্কর কিছু নয়। যেমন কানে চেপে ধরে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার জন্য ঐ অঞ্চলের টিস্যু মাইক্রো তরঙ্গের প্রভাবে খানিকটা গরম হয়ে যাচ্ছে হয়ত বা কখনও কিছু কোষ পুড়ে যাচ্ছে। ছোটদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। তাই চিকিৎসক মহল বলছেন যে দীর্ঘ সময় কথা বলার জন্য মোবাইল ফোনকে কানে চেপে না ধরে হেড ফোন বা ইয়ার প্লাগের সাহায্যে কথোপকথন চালালে তা ক্ষতি করবে তুলনায় কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO বা হু) মোবাইল ফোনের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার সংস্থার সাহায্যে গবেষণা চালিয়েছে। তাদের মতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিকিরণ "possibly carcinogenic to human" অর্থাৎ মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের ক্যান্সারের হয়ত বা সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিছু সতর্কতা অবলম্বনের কথাও বলা হয়েছে যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। (Ref. 2 দেখুন)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট মোবাইল ফোনের সঙ্গে যুক্ত বিকিরণের কী ধরনের প্রভাব মানবদেহে পড়তে পারে তা নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়েছে। তারাও প্রত্যক্ষ ক্ষতি হিসেবে কানের পাশের টিস্যু গরম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে দীর্ঘ সময় ধরে টানা মোবাইল ফোনের ব্যবহার

করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। তবে এই সংক্রান্ত গবেষণা সব সংস্থাই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আরও দীর্ঘ সময় ধরে ঐ বিকিরণের প্রভাব তারা দেখতে চান (Ref. 5 দেখুন)

আমাদের দেশে ২০১০ সালে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। এই কমিটি বিষয়টিতে এখনই খুব ভয়ের কিছু লক্ষ্য না করলেও বিকিরণের ব্যাপারে একটা দৃষ্টি রাখতে ও গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছেন। এই কমিটির রিপোর্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে (Ref. 1 দেখুন)।

CDMA এবং GSM দুটি ভিন্ন প্রযুক্তির মোবাইল ফোন যেগুলি কিছুটা ভিন্ন পাল্লার মাইক্রোতরঙ্গ কাজ করে। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থার মোবাইল ফোন অর্থাৎ CDMA, GSM বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয় সম্পর্কে বলার মতো জ্ঞান আমার নেই। তাই এই বিষয়গুলিতে তেমন কিছু বলতে পারছি না। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ ও তার চরিত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি এখানেও প্রযোজ্য। আসলে GSM এবং CDMA প্রযুক্তি দুটি সামান্য আগে পরে বাজারে এসেছে, কিন্তু মোবাইল ফোনের দ্রুত প্রসারের ফলে একটি দেশ একটি বিশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে এবং মোবাইল নির্মাতাদের এক একজন এক একটি প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে গেছে তাদের বাজারের কথা মাথায় রেখে। তবে আন্তর্জাতিক রোমিং-এর ক্ষেত্রে GSM-এর সামান্য কিছু বেশি প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে।

মোবাইল ফোন হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি কোনো পকেটে রাখলে অসুবিধা নেই, তার কাজের জন্য ব্যবহৃত তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মির কম্পাঙ্ক হৃৎপিণ্ডের কম্পাঙ্কের থেকে বহু বহু বেশি। শিশু বা অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোনের আলাদা ক্ষতিকারক ভূমিকা নেই। পেসমেকার যাদের শরীরে বসানো হয়েছে তাদের কিছু বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়, যেমন শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রে তাদের যাওয়া উচিত নয় কারণ শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র পেসমেকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ থেকে সেরকম কোনো সমস্যা নেই।

শহরাঞ্চলে চড়াই পাখির সংখ্যা হ্রাস এবং পরবর্তীকালে তাদের পুনরাগমনের বিষয়টিকে যদি মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয় তাহলে প্রয়োজন অনেক ব্যাপকতর পর্যালোচনা ও গবেষণার। যে কোনো প্রাণীর কোনো অঞ্চলে থাকা বা না থাকার বিষয়টি খাদ্যের ও পছন্দসই বাসস্থানের লভ্যতার ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। শ্রীভাদুড়ী ২৬শে এপ্রিলের হিন্দুস্থান টাইমস (কলকাতা সংস্করণ) সংবাদপত্রের যে অংশবিশেষের কপি পাঠিয়েছেন সেখানে এই বিষয়টি উল্লেখ করে চড়াই পাখির এই শহরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শ্রী ভাদুড়ীর নজরে এটা এসেছে এবং তিনি তার উল্লেখ করেছেন এজন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ কারণ এই সংবাদ এক অর্থে মোবাইল ফোনের হানিকর প্রভাবের বিরোধী। যে কোনো বৈজ্ঞানিক ইস্যু বা বিতর্কে এইভাবে উভয়দিকের বক্তব্যের দিকে সম্যক দৃষ্টি দেওয়ার মানসিকতা খুবই প্রয়োজনীয়।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চালু কথা হচ্ছে cost-benefit ratio বা লাভ-ক্ষতির অনুপাত, অর্থাৎ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কতটা উপকার হচ্ছে কতটা বা তার ফলে ক্ষতি বা সমস্যা হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে মানুষের একদিকে থাকে আগ্রহ অন্যদিকে থাকে কিছু আশঙ্কা। মোবাইল ফোনও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি প্রযুক্তি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে আমাদের কতটা প্রভাবিত করবে তা অনেক সময়ই সমাজ তথা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনো প্রযুক্তিগত কারণে যদি মোবাইল ফোন বা সেরকম কোনো উদ্ভাবনা আমাদের শারীরিক ক্ষতি করতে থাকে তাহলে তা দেশ সমাজ নিরপেক্ষভাবেই করবে। তবে আমাদের চারদিকের যে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ রয়েছে যারা আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করে না অর্থাৎ কোনো বেনিফিট পায় না তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার জনিত যে কস্ট-বেনিফিট (cost-benefit) অনুপাতের ধারণাটাই মূল্যহীন। তাই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এগুলি নিয়েও ভাবতে হবে যেমন শ্রী ভাদুড়ীর চিন্তায় এসেছে। আমার সীমিত জ্ঞানে এতগুলি বিষয়ের যাদের সম্পর্কগুলিও যথেষ্ট জটিল যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। শ্রী ভাদুড়ী যখন প্রসঙ্গটি তুলেছেন আশা করব আরও আগ্রহী মানুষ বিষয়গুলিতে আলোকপাত করবেন।

References

1. Report on Possible impact of communication tower on www.ee.iitb.gc.in
   (Report of the expert committee established by the ministry of Environment & forest)
2. www.stuk.fi
3. Electromagnetic fields and public health: mobile phones www.who.int/mediacentre/factsheets/fs 193/en/
4. No clear evidence that mobile phone radiation damages health. The Guardian (UK) April 26, 2012. www.guardian.co.uk
5. National Cancer Institute (USA) [Factsheet] (Some FAQ^s related to "cell phones and Cancer Risk" have been death with) www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/Cellphones

আরও অজস্র ওয়েবসাইটে মোবাইল ফোনের বিকিরণ জনিত সম্ভাব্য সমস্যার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নানারকম মতামত সেখানে রয়েছে। তবে সেগুলি গ্রহণ বা বর্জনের আগে সংস্থাটির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে।

উমা

ভীড়ে ভিড়বেন না

ভবানীপ্রসাদ সাহু

ঐ ভদ্রলোকের গল্পটা আমরা সবাই জানি। তিনি যে অফিসে কাজ করতেন, ঐ অফিসের ওপরওয়ালার একবার ইচ্ছে হল অধস্তন কর্মচারিদের মধ্যে কে তার স্ত্রী-কে ভয় পায় আর কে পায় না তা যাচাই করার। সবাইকে ডেকে জড়ো করা হল। ওপরওয়ালা দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে। তারপর বললেন, যারা তাদের স্ত্রীকে ভয় পায় তারা যেন তাঁর কাছে চলে আসে, আর যারা পায় না তারা যেন ঐখানেই থাকে। দেখা গেল বলা মাত্র সবাই হুড়মুড় করে ওপরওয়ালার দিকেই চলে গেল, শুধু থেকে গেলেন এই গল্পের ঐ ভদ্রলোক। সবিস্ময়ে ওপরওয়ালা তার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, এরা সবাই নিজেদের বৌ-কে ভয় পায়, সে কি বৌ-কে ভয় করে না! ভদ্রলোক মুখ কাঁচুমাচু করে জানালেন, আসলে তাঁর বৌ তাঁকে ধমকে পইপই করে বলে দিয়েছে যেখানে ভীড়ভাট্টা হবে সেখানে যেন তিনি না যান। এদিকে ওপরওয়ালার দিকটায় সবাই হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে ভীড় করেছে। ঐ ভীড়ের মধ্যে তিনি যদি যান, আর তাঁর বৌ যদি তা জানতে পারে, তাহলে—। বোঝা গেল, এই ভদ্রলোকও তাঁর স্ত্রী-কে ভয়ই পান, আর তাই ভীড়ে না ভেড়ার জন্য স্ত্রী-র সতর্কবাণীর আতঙ্কেই তিনি 'বৌ-কে ভয় পানেওয়ালাদের' ভীড়ে ভিড়তে পারেন নি।

গল্পটির মধ্যে মজা যাই থাকুক না কেন, ভদ্রলোকের স্ত্রী যদি সত্যিই ভীড়ভাট্টা এড়ানোর কথা বলে থাকেন, তবে তিনি যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক সতর্কবার্তার কথাই বলেছেন। হ্যাঁ, ভীড়ভাট্টার মধ্যে শুধু পকেটমার হওয়ার বা মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক নিগ্রহ ঘটার সম্ভাবনাই থাকে না, শরীর স্বাস্থ্যের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাবও যথেষ্ট এবং আমাদের এখনকার আলোচ্য এই দিকটাই।

ভীড় বলতে আমরা তাই বুঝি যখন একটি নির্দিষ্ট পরিসর স্থানে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ প্রায় গা ঘেঁষাঘেষি করে বা গাদাগাদি করে থাকে। এই স্থান কোনও খোলা জায়গায় হতে পারে, যেমন কুম্ভমেলা বা মকর স্নানের মতো ক্ষেত্রে, সভাসমাবেশে, হাটে বাজারে, রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা দেখা বা সিনেমার শুটিং দেখার সময় ইত্যাদি। আর হতে পারে কোনও বদ্ধ স্থানে, যেমন সিনেমা হলে, হলঘরে মিটিং-এর সময়, অফিস সময়ের যানবাহনে, বিশেষ কারণে একটি ঘরে বহু ব্যক্তি বা ছাত্রছাত্রীকে জড়ো করে রাখলে ইত্যাদি।

স্বাভাবিক পরিবেশে উন্মুক্ত স্থানের হাওয়ার উপাদান উল্লেখযোগ্যভাবে একই রকম থাকে। এটি সম্ভব হয় বাতাসকে নির্মল রাখার প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জন্য, যেমন বায়ুচলাচল, আবহাওয়ার তাপমাত্রা, সূর্যালোক, বৃষ্টি, অক্সিজেন ও উদ্ভিদের রাসায়নিক প্রভাব ইত্যাদি। যখন এই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাহত হয় বা কার্যকরী হতে পারে না, তখন হয় শারীরিক অস্বস্তি ও অসুস্থতা, যেমন ঘটে বিশেষত বদ্ধ ঘরে ভীড়ের মধ্যে।

কুম্ভমেলা বা মকর স্নানের অত্যধিক ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি, পদপিষ্ট হওয়া ইত্যাদির ভয় থাকলেও ভিড়ের কারণে অন্যান্য বিপদগুলি বিশেষ ঘটে না, চারপাশটা খোলামেলা থাকার জন্য। চঞ্চল ও সদা ধাবমান এই ভিড়ের সময় হাওয়া আবদ্ধও থাকে না যে, একজনের থেকে জীবাণুসংক্রমণ অন্য জনে ঘটবে। কিন্তু বদ্ধ ঘরের ভিড়ে পুরো ছবিটাই পাল্টে যায়। এটি ঘটে মূলত ঘরের বাতাসের নানাবিধ পরিবর্তনের কারণে।

যেমন ভিড়ে ঠাসা বদ্ধ ঘরের বাতাসে ক্রমশই কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং অক্সিজেন কমতে থাকে। বিশ্রামে থাকা একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ০.৭ ঘন ফুট কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছাড়ে। শারীরিক শ্রম করার সময় তা বেড়ে ২ ঘন ফুট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আবার বিভিন্ন বয়সের লোক সমাগম থাকলে তা গড়ে অন্তত ০.৬ ঘন ফুট হয়। স্পষ্টত এই ঘরে যদি খুব ভালভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকে তবে ঘরের মধ্যে ক্রমশই অক্সিজেন কমতে থাকে। তবে আগে ভাবা হত বদ্ধ ঘরের ভিড়ে ক্রমশ কমতে থাকা অক্সিজেন আর ক্রমশ বাড়তে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইডই অস্বস্তি ও শারীরিক কষ্টের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, অক্সিজেনের পরিমাণ কমে শতকরা ১৮ (মনে রাখা দরকার স্বাভাবিক ভাবে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ২০.৯৩ ভাগ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ) ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে শতকরা ৫ ভাগ হয়ে গেলেও আমাদের শরীর তার মোকাবিলা করতে পারে, এবং বিশেষ কোনও অস্বস্তি বা অসুবিধা না-ও হতে পারে, যদি ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহনশীল মাত্রায় থাকে।

এখন জানা গেছে, ভিড়ে ভিড়াক্কার বদ্ধ ঘরে মূল বিপদ ডেকে আনে বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার যুগলবন্দি। অর্থাৎ অক্সিজেন-কার্বনডাই অক্সাইডের অস্বাভাবিকত্বের মতো রাসায়নিক দিক নয়, তাপমাত্রা-আর্দ্রতার সঙ্গে বায়ু চলাচলের অভাব ও তাপের বিকিরণের মতো ভৌত দিকগুলিই অস্বস্তি ও শারীরিক বিপদ ডেকে আনার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কলকাতার সেই

বিখ্যাত কৃষ্ণ গহ্বরে (Black Hole of Calcutta) ১৪৬ জন বন্দিকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র ২৩ জন বেঁচেছিল। ঘরটি ছিল ১৮x১৪x১০ ফুট আকারের। কিন্তু তাতে দুটি জানালা ছিল, যা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সরবরাহ সম্ভব হয়েছিল, এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অক্সিজেনের অভাবে নয়, অতিরিক্ত তাপ জমার কারণেই ঐ মৃত্যু। অর্থাৎ ভিড়ে ভিড়াক্কার ঘরের মধ্যে ভৌত কারণেই প্রধান বিপদ ডেকে আনে—যার মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা ও তাপ, আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল ও তাপ বিকিরণ। এগুলিই জীবন্ত শরীরকে শীতল রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। এবং এইভাবেই আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের অসুবিধার জন্য নয়, অসুবিধার প্রধান জায়গাটা হল চামড়া।

বদ্ধ জায়গায় ভিড়ের মধ্যে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ার পাশাপাশি আরো কিছু ভৌত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এদের একটি যেমন তাপমাত্রার বৃদ্ধি। বিশ্রামের সময় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট তাপ ত্যাগ করে। (এক পাউন্ড জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়াতে যে তাপ লাগে তাকে বলা হয় ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট।) আর শারীরিক শ্রমের সময় এই তাপ ত্যাগের পরিমাণ ৪০০০ ইউনিটও হয়ে যেতে পারে। এইভাবে ভিড়ের ঘরে সবাই যদি চুপচাপ বসেও থাকে, তবু বায়ু চলাচল ঠিকমত না হলে ঘরের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ে। আর বদ্ধ ঘরে অনেকে মিলে যদি ব্যায়াম করে বা মারামারি করতে থাকে তবে তো কথাই নেই।

একইভাবে বাড়তে থাকে আর্দ্রতা। সবার চামড়া ও ফুসফুস থেকে যে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, তা যদি জমতেই থাকে তবে ক্রমশই অস্বস্তি ও বিপদ বাড়তে থাকে। আমরা যে শ্বাস ছাড়ি তার বাতাসের শতকরা ৬ ভাগ জলীয় বাষ্প। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় আমরা আমরা ১৮.৪ গ্রাম জলীয় বাষ্প বাতাসে ছাড়ি আর অত্যধিক ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রমের সময় তা ১৭৫ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। ফলে বদ্ধ ঘরে গাদাগাদি করে অনেকে ঘুমিয়ে থাকলেও বিপদ কম হয় না।

ভিড়ের মধ্যে বাতাসের স্বাভাবিক চলাচলও ব্যাহত হয়। এটি ভিড় বাসেও হতে পারে, হতে পারে বদ্ধ স্কুল ঘর বা হল ঘরে। এর ফলে ঐ স্থানের তাপ ও আর্দ্রতা যেমন বাড়ে, তেমনি অন্যদের গায়ের গন্ধ ও জীবাণুসংক্রমণও বাড়ে।

ভিড়ের মধ্যে ভৌত পরিবর্তনের অন্যতম এই অস্বস্তিকর গায়ের গন্ধও। ঘাম, নিঃশ্বাস, নোংরা মুখ গহ্বর ও জামাকাপড় ইত্যাদি থেকে এই গন্ধ বেরোয়, যা বাড়তে থাকলে সংবেদনশীল অন্যদের মধ্যে বমি বা বমিভাব, মাথা-ধরা ও অন্যান্য নানা শারীরিক অস্বস্তি ডেকে আনে।

আর ঘটতে পারে জীবাণু সংক্রমণ। সাধারণভাবে কথাবার্তা বলার সময়ও মুখ থেকে নানা ধরনের জীবাণু বাইরে বেরোয়। আর এটি বেশি করে ঘটে কাশি, হাঁচি বা চিৎকার করে কথাবার্তা বলার সময়। এমনকি বদ্ধঘরের ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে, ফলে সহজে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। হাসপাতালের ভিড় আউটডোরে বেশিক্ষণ থাকলে, বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে এইভাবে অন্য ব্যক্তির থেকে আসা জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সরকারি অনেক হাসপাতালের ইনডোরেও একই বেডে দু'তিন জন রোগি ভর্তি রাখতে হয়। এইভাবে ইনডোরের যে ঘরটি হয়তো ৪০ জন রোগির জন্য তৈরি করা হয়েছিল তাতে হয়তো থাকছে ১০০ জন অসুস্থ ব্যক্তি। এ কারণে জীবাণু সংক্রমণজনিত রোগের জন্য নয়, অন্য কোনও রোগ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীও যক্ষ্মা থেকে নিউমোনিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। একইভাবে প্রসার ঘটে কোনও অ্যান্টিবায়োটিকে সহনশীলতা অর্জনকারী (রেজিস্ট্যান্ট) জীবাণুরও।

বদ্ধ জায়গার ভিড়ের মধ্যে থাকতে থাকতে এইভাবে নানা বিপদই বাড়ে। টাটকা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে ভিড়ের লোকজনরা এক সময় মাথার যন্ত্রণা, ক্লান্তিবোধ, মনঃসংযোগের অভাব ইত্যাদি অনুভব করতে থাকেন। যত সময় যায় ততই এগুলি বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা। আর বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে তো কলকাতার ঐ অন্ধকূপ হত্যার মতো ভয়াবহ ঘটনাও ঘটতে পারে, যার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তাপ।

আর এই তাপের কারণেই ঘটে ঘাম। আরামদায়ক তাপমাত্রা মোটামুটি গড়ে ৭৭ থেকে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তার নিচে ঠাণ্ডা আর বেশি হলে গরম। এবং আরামদায়ক অবস্থায় প্রতি চার ঘণ্টায় ঘাম বেরোনোর কথা ১ থেকে ৩ লিটার। এই পরিমাণ যদি সাড়ে চার লিটারের বেশি হয় তবে তা অসহ্য অবস্থা। আমাদের দেশে গরমকালে ভিড়ের বাসে, বদ্ধ ঘরে প্রায়শই এমন অবস্থাই ঘটে।

তাই যেখানেই বেশি জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকে সেখান মুক্তভাবে নির্মল হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা থাকা অত্যবশ্যক। খোলা জায়গার চলমান ভিড়ের (যেমন হয় বিভিন্ন মেলায়) চেয়ে বদ্ধ জায়গায় প্রায় স্থির ভিড় অনেক বেশি বিপজ্জনক। আধুনিক বিভিন্ন শপিং মল, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্রেক্ষাগৃহ বা অডিটোরিয়ামে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা কাটাতে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা চব্বিশ ঘণ্টাই চালু রাখতে হয়। কিন্তু আগুন লেগে বা কোনও কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। তখন ঘটে ভয়াবহ বিপর্যয়। ডিসেম্বর, ২০১১ কলকাতার আমরি হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ড এবং তারপর প্রায় একশত মানুষের মৃত্যুর পেছনে এই পরিস্থিতির ভূমিকা যে কতটা তা আমরা সবাই জানি। **ঊমা**

বনবিহারীর ধর্ম-ভাবনা

সমীরকুমার ঘোষ

গত সংখ্যার পর

৫ জুলাই ১৯৬৫ প্রয়াত হন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তৎকালীন কোনও সংবাদপত্রে সে খবর প্রকাশিত হয় না। ৬ জুলাইয়ের স্টেটসম্যান পত্রিকায় ব্যক্তিগত কলমে মৃত্যু শিরোনামের নীচে প্রকাশিত একটি সংবাদে শুধুমাত্র লেখা হয়েছিল— On July 5, 1965, M.B. retired Civil Surgeon aged 80. 'Rest in peace', বলা বাহুল্য এই সংবাদকণিকাটুকু ছাপানো হয়েছিল টাকা দিয়ে।

পরিমল গোস্বামী যথাযথভাবেই লিখেছিলেন—'এতবড় দুর্ভাগ্য সবার চোখের সামনেই ঘটল। তিনি কোথাও সভাপতিত্ব করেন নি, প্রধান অতিথি হন নি, জন্মদিন করেন নি, কিন্তু সে তাঁর অপরাধ নয়। তাঁর দান সাহিত্য জগতে রেখে গেছেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে সাহিত্য ইতিহাসের অধ্যায় লেখা তাঁর কর্তব্য নয়, সে কর্তব্য ইতিহাস লেখকের।'

বনবিহারীর প্রতি এই ঔদাসীন্য পরিমলবাবুর মতো মানুষদের যতই পীড়া দিক, এ তাঁর প্রাপ্য ছিল। কেন আমরা তাঁকে মাথায় তুলে নাচব! হতেন তিনি কোনও বড় বড় বুকনি-ঝাড়া ধর্মীয় নেতা বা রাজনীতিক, নিদেন আরাম-কেদারা সাহিত্যিক-কবি, শোকোচ্ছ্বাসে দেশ ভাসিয়ে ফেলতাম! তা না করে তিনি আক্রমণ করেছেন ভারতীয় ধর্মের যে মূল দুটি স্তম্ভ, সেই পুনর্জন্ম আর কর্মফলকে। তিনি সনাতনী আচার-বিচারকে প্রবল বিদ্রূপে আঘাত করতে চেয়েছেন, সমস্ত জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন নি। এমন কালাপাহাড়দের যত দ্রুত বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দেওয়া যায়, ততই দেশ ও দশের মঙ্গল!

পরিমলবাবুর বা সৈয়দ মুজতবা আলির খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, তাঁরা বনবিহারীর কথা, তাঁর সাহিত্যকৃতির কথা সকলকে জানাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন! পরিমলবাবু তৎকালীন বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা যুগান্তরে রবিবাসরীয় সাময়িকীতে 'স্যাটায়ারিস্ট বনবিহারী মুখোপাধ্যায়' নামে একটি লেখা ছাপান ১১ই জুলাই, মৃত্যুর ৬ দিন পরে। সেই লেখা পড়েই বহু লোক জানতে পারে তাঁর প্রয়াণের কথা।

লেখাটি পড়ে সুবিখ্যাত লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী চিঠিতে লিখেছিলেন—'আপনার প্রবন্ধে জানতে পারলাম, প্রায় ৪০ বছর আগে আমাদের সেকেলেদের সমসাময়িক লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। আপনার ঐ লেখাটি না বেরুলে তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা বন্ধুরা কেউই তৎকালীন বিশিষ্ট এবং এখনকার বিস্মৃত এই একটি লেখকের লোকান্তরের খবর জানতে পারতেন না। কোন না কোন কাগজের একটি কোণেও মনে হচ্ছে এ খবর বেরোয় নি। সম্ভবত সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁকে মনে করার মত আর কেউ নেই।

কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনুরাগী ভক্ত পাঠক-পাঠিকা কম ছিলেন না। যাঁরা মাসের পর মাস বঙ্গবাণীতে দশচক্র পড়ার জন্য উৎসুক থাকতেন।... কোন এক সময়ে 'নরকের কীট' পড়েছেন শনিবারের চিঠিতে। 'সিরাজির পেয়ালা'র কঠিন শাণিত ব্যঙ্গ পড়ে বিধবা-সধবা মেয়েরা কঠিন পাথর হয়ে গেছেন, ভাবনা আর বেশি এগোতে পারে নি তাঁদের ভীরু মনে। এবং আজও ভুলে যান নি তাঁর কঠিন উক্তিময় রচনা।... দশচক্রের শশী, নিশি, তাদের পিতৃমাতৃপরায়ণতা, অবার তাদের নিজস্ব ব্যক্তিমতবাদ পড়তে পড়তে লেখকের দুধারে কাটা শাণিত উক্তি ও যুক্তি, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গিতে ও আজকালকার সমস্যামূলক গল্প উপন্যাসের কথাবার্তার ভঙ্গিতে যে কত পার্থক্য তা বলে শেষ করা যায় না। দশচক্রে তীক্ষ্ণ সমাজদর্শন যেমন আছে, তেমনি স্নিগ্ধ উক্তিও উঁকি দিয়ে যায়...। তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকের যে ভাবসঙ্ঘাত, তা বেশীরভাগই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে ফুটে উঠলেও সমস্ত বক্তব্য, ও দেখার অন্তরে অন্তরে, তাঁর সহৃদয় মানবসত্য দর্শনই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নিন্দা ধিক্কার দিতে গিয়েও সহসা আর একদিক দেখতে পেয়ে থেমে গেছেন যেন! সিরাজির পেয়ালা আর নরকের কীট, দুটি গল্পে ছত্রে ছত্রে লেখকের মন আলোর মত দেখা যায়। ভণ্ডামি ভানের আড়ালে মানবমনের কি বেদনাময় দর্শন।'

জ্যোতির্ময়ী দেবী নিজে মহিলা ছিলেন বলেন মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, নিপীড়ন সবেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন, সর্বোপরি লেখিকা ছিলেন বলে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছিলেন অনেক বেশি। এই কারণেই বনবিহারীর লেখা তাঁকে এত নাড়া দিয়েছিল। এগারো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী। বিয়ের পর কখনও জয়পুর, কখনও গুপ্তিপাড়া ও পাটনায় তাঁকে থাকতে হয়েছে। নানা জায়গায় মেয়েদের অবস্থা দেখেছেন। নিজের লেখায় সে সবই ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক কোনও পত্রপত্রিকা বা বই তাঁর না-পড়া হত না। বহু পত্রিকা যত্ন করে রেখেও দিতেন। পরিমলবাবু জানিয়েছেন, 'তাঁরই সংগ্রহ থেকে অধুনা অপঠিত এবং বিস্মৃত 'সিরাজির পেয়ালা' নামক অবিস্মরণীয় উপ-উপন্যাসটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে (১২-৪-৬৬) পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল।

তিনি এও লিখেছেন, 'আমাদের দেশের কোনো লেখিকা অন্যের লেখা সম্পর্কে এতখানি সশ্রদ্ধ মত প্রকাশ কোথাও করেছেন কি না আমার জানা নেই। আমি 'অন্যের' অর্থে প্রকৃত শক্তিশালী অথচ অবজ্ঞাত লেখক সম্পর্কেই বলছি। অন্যের অনুকরণে প্রসিদ্ধ লেখককে প্রশংসার কথা বলছি না। অবশ্য এ কাজে লেখার মূল্য নিরূপণের সহজ ক্ষমতা এবং সে বিষয়ে মত প্রকাশের মতো সাহস থাকা চাই। এ সাহস আসে যখন নিজেরই প্রতি নিজের প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগে। যখন নিজের একটি জীবনদর্শন রচিত হয়ে যায়।'

বনবিহারীর মেজভাই বিজনবিহারী থাকতেন গিরিডিতে। তাঁর দাদার মৃত্যুর সপ্তম দিনে যুগান্তর-এ পরিমলবাবুর লেখাটি পড়ে তিনি একটি চিঠি পাঠান। তাতে লেখেন—

'আমার মেজদা বনবিহারীর বিষয় আপনার যে আলোচনা কিছুদিন পূর্বে যুগান্তরে বেরিয়েছে তা আমি পড়েছি, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ ছিল, তাই এ বিষয়ে আপনার আরও কিছু লেখার প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।... দূর থেকে বনবিহারীবাবুকে এখনো কেউ বোঝে নি, বোঝা যেত না, এবং ঐটেই তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সৈয়দের (মুজতবা আলি) লেখায় বনবিহারীবাবুকে ঘোরতর নাস্তিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু আমি জানি সেটা তাঁর আসল রূপ নয়। তিনি জ্ঞানবুদ্ধিবিচার পথের পথিক ছিলেন। তিনি দয়া ক্ষমা করুণায় প্রকৃত সহৃদয় লোক ছিলেন। আবার ধৈর্য সহিষ্ণুতায় এবং সত্য পথে চলায় তিনি কঠিন কঠোর ও দুঃসাহসী বীর ছিলেন। তাঁর কোন কাজেই আড়ম্বর বা প্রচার ছিল না। এক দিক দিয়ে তিনি নীরব গোপন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে রঙ্গরসিকতায় ও ব্যঙ্গে তিনি উচ্ছল ও মুখর ছিলেন। ডাক্তার তুলসী ভট্টাচার্য তাঁর এই বাল্যবন্ধুর কথা বলতে বলতে প্রায় মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, সে একজন ক্ষণজন্মা লোক ছিল।— কথাটি খুব মিথ্যা নয়। বনফুলের যে চতুর্দশপদীটি 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটি বনবিহারীবাবুর একটি দিককে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে এবং বলার ভঙ্গিতে তাঁর মাস্টারমশাইয়ের রূপ ধরা পড়েছে।...

সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসার ও সমাজপীড়িতদের জন্য তাঁর চোখের জল পড়তেও দেখেছি।... তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর অসীম মনোবল। ছোট-বড় অনেক সাংসারিক দুর্যোগ ঘটনার মধ্যে এবং কর্মজীবনের অনেক জটিল সমস্যার মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ অবিচল থাকতে দেখেছি।'

বিজনবিহারীর চিঠিতে বনবিহারীর চরিত্রের এমন অনেক দিক উঠে আসে, যা একেবারেই অজানা। অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন, সদাযুযুধান বনবিহারীর সঙ্গে তার যেন মিল নেই! বিজনবিহারীর চিঠি থেকেই জানা যায়, তাঁদের জ্যাঠতুতো বড় ভাই ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের কমিক অভিনেতা। তিনি পাঠ্যাবস্থায় যখন বিজনবিহারীদের বাড়িতে থাকতেন তখন বনবিহারীর সাহচর্যে তাঁর আবৃত্তি ও নাট্যকলা শিক্ষা হয়।

'ছবি আঁকা, মডেলিং করা, তাঁর হবি ছিল। তিনি বহু কার্টুন চিত্রও এঁকেছিলেন। শত শত কবিতা গান তাঁর মুখস্থ ছিল, অনেক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত গুনগুন করে গাইতেন। অনেক সময় উচ্চকণ্ঠেও গাইতে শুনেছি,' জানিয়েছিলেন বিজনবিহারী। উল্লেখ্য, তৎকালীন শনিবারের চিঠি ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় তিনি বহু ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। আরেক ভাই শিল্পী বিনোদবিহারী জানিয়েছেন, 'ভারতবর্ষে বাঙালীর দশদশা নামে সর্ব প্রথম যে ব্যঙ্গ চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক জলধর সেন মশায় সেই সঙ্গে যে ভূমিকা দিয়েছিলেন তা থেকে চিত্রকরের নাম জানা যায় না। সেটি দাদার সর্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্র।'

বিজনবিহারীর চিঠিতে পরের দিকে অবধারিত ভাবে চলে আসে সেই বনবিহারীর কথা, যাঁর হাতে আর বংশী নেই, খরতর সুদর্শন চক্র। বিজনবিহারী লিখছেন, 'তিনি তাঁর যৌবনকালে সমাজের বাধা ঠেলে নিজ পৌরোহিত্যে তাঁর বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দেন, হিন্দু শাস্ত্রমতে। তখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহের পর হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে এটি পরবর্তী বিধবা বিবাহ। এই বিবাহ বাসরে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সার আশুতোষ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মা যদিও বিদ্যারত্নের কন্যা, তবু তিনি এ বিবাহে মত দিয়েছিলেন। ১৯১৩ -১৪ সনে মেজদার বিলেত যাওয়া নিয়েও এই রকম অনেক সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। আমরা কিছুদিনের জন্য একঘরে হয়েছিলাম।'

কর্মজীবনেও মেজদার এই রূপ চ্যালেঞ্জ বিরল নয়। তিনি যখন দিনাজপুরে সিভিল সার্জন, তখন সরকারের একটা সিভিল ডিজোবীডিয়েন্স বিরোধী অভিযান শুরু হয়, তাতে গভর্মেণ্ট সব জেলা অফিসারদের সহযোগিতা দাবী করে। একা মেজদা তাতে যোগ দেন নি, সেজন্য তাঁকে খারাপ জায়গায় বদলি করা হয়। মেজদা জেলের অনেক দণ্ডবিধির বদল ঘটিয়েছিলেন, কয়েদীদের খাওয়া থাকার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, সব পারেন নি, শেষে যথা সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন।...

আয় করেছেন অনেক ব্যয়ও করেছেন অনেক, কিন্তু নিজ হাতে করেন নি... নিজের পায়ে নিজে অপারেশন করেছেন দেখেছি, লোকাল অ্যানিস্থিসিয়াও ব্যবহার করেন নি।... তাঁর অসীম মনের বল, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে স্বাবলম্বী থেকেছেন, ছেলে-মেয়ে কাউকে তাঁর ভার বইতে দেন নি।... আত্মভোলা, স্বার্থহীন, নিরাসক্ত, নির্ভীক— তিনি নাস্তিক ছিলেন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তা কে বলতে পারে।'

নিজের এই মাস্টার মশাইয়ের নানা কীর্তির কথা বনফুল প্রায়ই লিখে পাঠাতেন বন্ধু পরিমল গোস্বামীকে। বনবিহারীর কাছে হাসপাতালে বেড খালি নেই জানার পরেও অন্য ডাক্তারের কাছে তদ্বির করতে গিয়ে বা ভিড় আউটডোরে অন্য ডাক্তারের চিঠি এনে সবাইকে টপকে দেখানোর সুযোগ নিতে গিয়ে দুই ভদ্রলোকের হেনস্থার ঘটনা জানানোর পাশাপাশি বনবিহারী একবার ঊর্ধ্বতন সাহেবকে কেমন সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন সে কথাও জানান। ঘটনাটি এরকম— বনবিহারী তখন সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার হয়েছেন অল্পদিন। ছাত্র বলাইচাঁদ ছিলেন তাঁর ক্লার্ক। বলাইচাঁদ জানাচ্ছেন, 'আমাদের কাজ ছিল দোতলার একটা ঘরে। সার্জেনদের সঙ্গে দেখা হত না। হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গে নীচে স্টীন সাহেবের দেখা। স্টীন তখন ওখানকার সেকেন্ড সার্জন। তিনি বনবিহারীবাবুকে বললেন, 'বনবিহারী আজকাল তোমার মুখ দেখতে পাই না, ব্যাপার কি?' বনবিহারী বললেন, 'এখন আমি রেজিস্ট্রার, সেই জন্যই দেখতে পাও না।' সাহেব বললেন, 'ও! আমি জানতাম না।'

সাহেব চলে যাবার পরদিন বনবিহারী আমাকে বললেন, 'চলো নীচে, আজ আর কাজ করব না।' নীচে গেলাম। স্টীন সাহেব ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। বনবিহারী তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর স্টীন যেই একটু দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, বনবিহারী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমনি কয়েকবার হতেই স্টীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? তুমি আজ অফিসে নেই কেন?' বনবিহারী বললেন,'তুমি অভিযোগ করেছিলে আমার মুখ দেখতে পাও না, তাই মুখ দেখাচ্ছি।'

এইটুকু জানবার পর পরিমলবাবু মন্তব্য করছেন—'মেডিক্যাল কলেজের সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রারের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক মনে হবে। দেখা যাচ্ছে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব এখানে প্রধান, পারিপার্শ্বিক বা কৃত্রিম পদমর্যাদা ভেদ করে তা সময়ে অসময়ে বেরিয়ে পড়ে। কলমে তিনি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেন, হাতেও যে সেই একই ব্যক্তি ব্যঙ্গ করতে পারেন, সে দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দেখিয়েছেন। কিন্তু বনবিহারীর এই ব্যঙ্গের চেহারা উগ্র রকমের স্বতন্ত্র। এর আর জুড়ি নেই। বনবিহারীর হাতে-কলমে যে ব্যঙ্গ অধিকাংশই প্রকাশ্যত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কিন্তু মূলে মূঢ়তার প্রতি অসহিষ্ণুতা। প্রকৃত ব্যঙ্গকারীকে কিছু নিষ্ঠুর হতেই হয়, যদিও তা নিজের স্বার্থে নয়। এবং বনবিহারীর ক্ষেত্রে এ সবই অবশ্য ব্যবহারিক ব্যঙ্গ।'

বনবিহারীর এক ছাত্র ডাক্তার ধীরেন্দ্র চৌধুরী একটি ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন পরিমলবাবুকে। ঘটনাটি হল— 'বনবিহারী যখন মৈমনসিংহে, তখন সুসং রাজবাড়িতে একটি কল পান। জায়গাটা দূরে, আসা যাওয়া বাদে তাঁকে এ জন্য তাঁরা পাঁচ শত টাকা ফী দেবেন স্থির হয়। যাবার কিছু পূর্বে দূর পল্লী থেকে এক অত্যন্ত গরিব ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়েন তাঁর পুত্রের টাইফয়েড, বাঁচবার কোনো আশা নেই, তবু শেষবারের জন্য বনবিহারীবাবু যদি একবার তাকে দেখেন, তবে তাঁর নিজের আর কোনো অনুতাপ থাকবে না। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আপনার ছেলেকে দেখব। তিনি সুসং-এর ডাক বাতিল করে দিলেন, এবং নিজের খরচে দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ছেলেটিকে দেখলেন।'

এই কাহিনী জানলে এখনকার ডাক্তাররা বনবিহারীকে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার জন্য মূর্খ বা অবিবেচক বলবেন। পাগলও বলতে পারেন। বনবিহারী তৎকালীন বিলেতফেরত ডাক্তার ছিলেন। তিনি যে দরের চিকিৎসক ছিলেন প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করলে পয়সা রাখার জায়গা হত না। এখনকার ডাক্তাররা গরিব রোগীকেও তিন-চার কোপে কাটেন। প্রথমে মোটা টাকা ফি, তারপরে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার কমিশন, ওষুধ লেখার জন্য ওষুধ কোম্পানির প্রীতি-উপহার, পেসমেকার থেকে চোখের লেন্স—এসব বসানোর জন্য আরেক ধাপে কমিশন। সেখানে বনবিহারী সেই সময়কার পাঁচশো টাকা ফি হেলায় ঠেলে নিজের গ্যাঁটগচ্চা দিয়ে এক গরিবের সন্তানকে দেখতে গেলেন। আর গেলেন বলেই প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রয়াত মানুষটিকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে বসি, বনফুল লেখেন অমর উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর'। লাখ-কোটি টাকা কামানো অতি-বড় চিকিৎসকও হারিয়ে যান ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

এই ঘটনার কথা জানতে পেরে পরিমলবাবু লিখছেন, 'এই যে কাজ তিনি করলেন, এটা শোনার পরেও কি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় বনবিহারী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা তাঁর ধর্মবিশ্বাস কী ছিল? তিনি সমস্ত জীবন এ কাজ করেছেন।'

বনবিহারীর ধর্ম-ভাবনা কী ছিল তা তাঁর উপন্যাস 'দশচক্র' পড়লেই বোঝা যায়। সেখানে এক জায়গায় তিনি লিখছেন—'একজনকে ডুবিতে দেখিলে আর একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। যে সাঁতার জানে না সেও ঝাঁপাইয়া পড়ে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায়। ধর্ম-প্রচারকেরা বলেন, মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছে ধর্ম। হইতে পারে বিশ্বচরাচরে এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি ধর্মপ্রণোদিত হইয়া আর্তত্রাণ করেন— স্বর্গের আশায়, ভাল অপ্সরার পাশে বসিবার লোভে, বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার কামনায় পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ লোক যে অনেক সময় নিজেদের বিপন্ন করিয়া পরকে বাঁচাইতে যায়, সে শুধু পরের দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে বলিয়া।... পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, এমন সময় যদি দেখি একজন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমানের ঘর বাঁচাইবার জন্য—তবে বুঝিতে পারি ইনি সহজ লোক নন। ইনি ধার্মিক।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আধুনিক ভারতের তীর্থক্ষেত্র দেখে এলাম

নিরঞ্জন বিশ্বাস

বছর কয়েক আগে থেকেই জানতে পারি ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অমর শহিদ আবুল বরকতের জন্মস্থান আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। কিন্তু সঠিক অবস্থানটা না জানায় জন্মস্থানটি দেখার আগ্রহটা দীর্ঘদিন মনে মনেই থেকে গেছে। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রত্যুষ' নামের পাক্ষিক পত্রিকাটি তার ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায় 'বরকতের জন্মভিটায় শহীদ দিবস উদ্‌যাপন' লেখাটিতে জন্মভিটার অবস্থান থেকে শুরু করে ১৯-২১শে ফেব্রুয়ারি '১২ তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত খবর প্রকাশ করে। তাতে আবুল বরকতের জন্মস্থান দেখার আগ্রহটা বিশেষভাবে অনুভব করি। এই সময়ে অন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনে বহরমপুর যাওয়ারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেলে বহরমপুর নিবাসী ভাইকে বলে রাখলাম যদি সকালে রওনা হয়ে রাত ১০টার মধ্যে ফিরে আসা যায় তাহলে যেন একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে প্রাথমিক ভাবে কথা বলে রাখে। আমি ৩রা মার্চ '১২ বহরমপুর পৌঁছলাম। ৬ই মার্চ '১২ মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকায় আবুল বরকতের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সাথি আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও শ্রদ্ধাস্পদ বিশ্বনাথদা। ভাইয়ের কাছে যাবার উদ্দেশ্যের কথা শুনেই পঁচাত্তর ঊর্দ্ধ বিশ্বনাথদা বললেন উনিও সাথি হবেন। বিশ্বনাথদাকে নিয়ে বহরমপুর সড়ক সেতু দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে সালার অভিমুখে পথ চলা শুরু হল। প্রায় বারোটা নাগাদ সালার পৌঁছলাম। পুরোনো শহর। সরু রাস্তা। সালার থেকে প্রায় ঘণ্টা খানেক পথ অতিক্রম করে আবুল বরকতের জন্মভূমি বাবলা গ্রামে পৌঁছলাম। সরু পাকা রাস্তা বাবলা গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করতে করতে এগোচ্ছি। সামনেই দেখলাম 'বরকত ভবন'। গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদের দেখেই সিঁড়িতে বসা কয়েকজন লোক এগিয়ে এলেন। বললাম আমরা শহীদ আবুল বরকতের গ্রাম, জন্মভিটা দেখতে এসেছি, তাঁর পরিবার আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলব, জানব আবুল বরকতকে আপনারা কীভাবে ধরে রেখেছেন। শহীদ আবুল বরকত কেন্দ্র দেখভাল করার দায়িত্ব যাঁর ওপর তিনি কাছেই ছিলেন, বাড়ি থেকে বরকত ভবনের চাবি এনে দরজা খুলে দিলেন। বরকত ভবনের গায়ে লেখা—শহীদ আবুল বরকত কেন্দ্র, বরকত ভবন, স্থাপিত ২০০৫-০৬, বাবলা।

বরকত ভবনে ঢুকলাম। দেখলাম ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন সংগ্রামে আরো যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতেও বরকত ভবনের এক একটা কক্ষ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, ভাষা শহীদ জব্বার লাইব্রেরি কক্ষ, ভাষা শহীদ রফিক কক্ষ ও ভাষা শহীদ সালাম কক্ষ।

বরকত ভবনে ঢুকলাম। দেখলাম ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন সংগ্রামে আরো যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতেও বরকত ভবনের এক একটা কক্ষ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, ভাষা শহীদ জব্বার লাইব্রেরি কক্ষ, ভাষা শহীদ রফিক কক্ষ ও ভাষা শহীদ সালাম কক্ষ। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর একটা বাঁধানো খাতায় অন্য পর্যবেক্ষকদের মতো আমরাও আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করে এলাম। শহীদ আবুল বরকত কেন্দ্রের কাছেই তাঁর জন্মভিটা। জন্মভিটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বরকতের বাড়িতে নিজের পরিবারের কেউ নেই, দেশ বিভাগের পরপরই তাঁর পরিবারের লোকজন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলির চারপাশ দেখলাম। বাড়ি দেখভাল করেন এমন এক ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ হল। জন্মভিটা দেখার পর বাবলা গ্রামেই বরকতের নামে প্রতিষ্ঠিত শহীদ বরকত প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। দোতলা স্কুল। শিক্ষক মহাশয়গণ আমাদের তাঁদের স্টাফরুমে নিয়ে বসালেন। বললাম, ইচ্ছে আছে একবার ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে যে সকল অনুষ্ঠান হয় তা দেখার জন্য আসব। শিক্ষক মহাশগণ বললেন আসুন থাকার জায়গার অসুবিধা হবে না, আপনাদের জন্য স্কুলঘর ছেড়ে দেব।

এরপর ফেরার পালা। প্রায় বেলা আড়াইটা নাগাদ রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য তালিবপুর স্কুল হয়ে বাড়ি ফেরা। এই স্কুল থেকেই

আবুল বরকত ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তাই তাঁর স্মৃতিবিজরিত স্কুলটি দেখার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারলাম না। বেলা ৩টা নাগাদ তালিবপুর স্কুলে পৌঁছলাম। শিক্ষক মহাশয়গণকে বললাম আমাদের আসার উদ্দেশ্যের কথা। শুনে তাঁরা খুব খুশি হলেন এবং বললেন মাঝে মাঝে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন একই উদ্দেশ্যে আমাদের তালিবপুর স্কুলে আসেন এবং তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করেন। স্কুলেমিনিট পনেরো কাটিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

প্রায় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বহরমপুর এসে পৌঁছলাম। নিজেকে খুব হাল্কা মনে হল—এখনও তাই মনে হচ্ছে। হাল্কা মনে হল এই ভেবে, আবুল বরকতের ভিটে-মাটি স্পর্শ করা নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে ছিল—অন্ততপক্ষে আক্ষরিক অর্থে এটা করা গেছে। জনমুখী এই সংগঠনের বিগত বছরের কাজকর্ম ছিল নিম্নরূপ:—

১. দুস্থ মানুষকে ১৭০টি বস্ত্র বিতরণ।

২. বধির মোঃ মশাইকে একটি শ্রবণযন্ত্র প্রদান।

৩. তালিবপুর স্কুল থেকে (পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে) আবুল বরকত ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিকে যে ছাত্র/ছাত্রী সর্বোচ্চ নম্বর পায় তাকে আবুল বরকত স্মৃতি স্মারক প্রদান করা হয়।

৪. তালিবপুর স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর একটি ছাত্র বছর তিনেক ধরে অসুস্থ। তার চিকিৎসার জন্য সংঘ থেকে ২,০০০ টাকা তার বাবা ইন্নাৎ শেখের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৫. এপার বাংলা ওপার বাংলার সমাজমুখীন বিদগ্ধ জ্ঞানী-গুণী জনের ভাবনাচিন্তায় সমৃদ্ধ স্মরণিকা 'রক্তলেখা' এবারই প্রথম প্রকাশ করা হয়।

৬. শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩দিনের কর্মসূচি পালন—১৯শে ফেব্রুয়ারি'১২ সন্ধ্যা — লোকসঙ্গীত, বাউলগান। ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা—সবদর হাসমির নাটক 'হত্যারে'। রাত ৮ ঘটিকা—আতস বাজি প্রদর্শনী। রাত ৯ ঘটিকা — সঙ্গীত পরিবেশন। রাত ১২টা ০১ মিনিট—আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতাকা উত্তোলন, ভাষণ। রাত ৩টা থেকে ৪টা— মশাল মিছিল পরিক্রমা। ২১শে ফেব্রুয়ারি — বেলা ৩টা থেকে ৫-৩০ মি— শহীদ স্মৃতি তর্পণ। অংশগ্রহণে — সাংসদ অধীর চৌধুরী ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। রাত ৮টা থেকে সারা রাত — লোকসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আলকাপ গান।

শেষ করার আগে 'বরকত স্মৃতি সংঘ'-র কাজের একটু পরিচিতি দেয়া প্রায়োজন বলে মনে করছি। এই সংগঠনটি 'শহীদ আবুল বরকত'কে জনমনে জাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে সর্বদা সচেতন।

সূত্র: 'প্রত্যুষ পাক্ষিক, বহরমপুর ২৫শে ফেব্রুয়ারি'১২। উমা

সংগঠন সংবাদ

অন্যান্য বছরের মতো প্রভাতফেরিযোগে ১৪১৯ সালের প্রথম দিন শুভ ১লা বৈশাখকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় স্বাগত জানানো হল। আয়োজনে দারিদ্রের ছাপ ছিল কিন্তু অনুভূতির ঘাটতি ছিল না। শুভ নববর্ষকে স্বাগত জানাবার উদ্যোগটি ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়। এ বছর আমরা বিংশতি শুভ নববর্ষ দিবস উদ্‌যাপন করলাম। আমাদের অনাড়ম্বর প্রস্তুতিতে প্রথম ভ্যানরিক্‌শাটিতে ছিল ব্যাটারি, লাউডস্পীকার আর দ্বিতীয় ভ্যানরিকশাটিতে ছিল হারমনিয়ম, বায়া-তবলা। দ্বিতীয় ভ্যানের পশ্চাৎভাগে চারটি মাইক্রোফোন হাতে গায়কদের সারি। গায়কদের সারির পেছনে নবীন-প্রবীণ প্রাণোচ্ছল স্বাগত যাত্রীগণ। বড়জাগুলি 'তরুণ সংঘ' ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে 'এসো হে বৈশাখ, এসা এসো' গানটি গাইতে গাইতে সুরের সাথে সাথে পা মেলানো শুরু। গায়ক শিল্পীদের সাথে আমরাও সকলে গলা মেলালাম। বিভিন্ন গানের মধ্যে ছিল দেশাত্মবোধক ও ঋতুপর্যায়ের গান। গানের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দু'পাশে জড়ো হওয়া জনসাধারণকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ। এভাবে পরপর গান, কবিতা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ঘণ্টা দেড়েক পথ পরিক্রমার পর সাড়ে আটটা নাগাদ তরুণ সংঘ প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। সকলকে প্রথমে লেবু-নুন-চিনির সরবৎ দেয়ার পর সামান্য জলযোগ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তার মধ্যে সাত-আট বছরের শিশু থেকে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধও ছিলেন। সবচেয়ে ভাল লেগেছে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ দেখে। সুকান্ত শিশু শিক্ষা নিকেতন ও বড়জাগুলি অ্যাথলেট কোচিং কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। আমাদের মতো তথাকথিত এগিয়ে থাকা ঘরের বাপ-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রভাতফেরিতে পাঠাতে নারাজ। পরিক্রমায় ভোরের সামান্য রোদ্দুরে কপালে নাকে-মুখে দু'চার ফোঁটা ঘাম গড়াতে দেখলে তাঁরা কষ্ট পান। আদিবাসী মা-বাবারা এই বাস্তব বর্জিত পিছিয়ে পড়া মানসিকতা থেকে এখনও মুক্ত।

সবশেষে বলি, বিগত বিশ বছরে এই সেকুলার নববর্ষ উৎসবের যে বিকাশ হওয়া দরকার ছিল তা কিন্তু হয় নি। ব্যবসায়ী সমাজের গণেশপূজা, হালখাতা, ভালমন্দ খাওয়া দাওয়ার মধ্যেই নববর্ষ উদ্‌যাপন আটকে রয়েছে। কাগজেপত্রে যতটুকু খবর পাই তা থেকে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ নববর্ষকে ঘিরে সচেতনভাবে উৎসব তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক। তারা ঠেকে শিখেছে, তাই তাদের এত দরদ।

নিরঞ্জন বিশ্বাস, হিন্দোল, বড়জাগুলি

প্রকৃতিকে ওঁরাই চেনেন ভাল

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী প্রায় ডজনখানেক দেশ থেকে দেড় লক্ষাধিক বেখেয়ালী মানুষ মারা গেল ২০০৪ সনের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামিতে। অথচ ভারতের দূরবর্তী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে বসবাসকারী পাথুরে যুগের মানুষদের কোনই ক্ষতি হয়নি। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আগামী দিনের সম্ভাব্য কোন মহাদুর্যোগের মোকাবিলায় একটি নির্ভরযোগ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী পূর্বাভাস পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য যে উৎসের প্রয়োজন, তার চাবিকাঠি রয়েছে এই আদিম গোত্রেরই হাতে।

বিগত ২৬ ডিসেম্বরে সংঘটিত সুনামির ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা। অথচ ভূগর্ভস্থ ভূকম্পন কেন্দ্র ছিল এদের বাসস্থানের প্রায় কাছেই। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, তাদের বেখেয়ালী এশিয়ান প্রতিবেশীদের তুলনায় প্রাকৃতিক পূর্বাভাস অনুধাবনের ক্ষমতা এই আদিবাসীদের অনেক বেশি।

ভয়ংকর এই তরঙ্গাভিঘাতে মারা গেল বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেড় লক্ষ মানুষ, যারা পূর্বাহ্নে কিছুই জানতে পারেনি। অথচ এসব দ্বীপে বসবাসকারী Onges, Jarawas, Sentinalese ও Great Andamanese গোত্রের লোকেরা আগেভাগেই সমুদ্র উপকূল থেকে উঁচু বনভূমি এলাকায় সরে যায় এবং সুনামির কবল থেকে বেঁচে যায়। কলকাতায় অবস্থিত অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র পরিচালক রাঘবেন্দ্র রাও বলেন, 'এসব গোত্রের লোকজন প্রকৃতির কোলে বসবাস করে এবং জৈবিক সতর্কতা সংকেত যথা পাখির ডাক বদলে যাওয়া এবং জল ও স্থলে প্রাণীদের আচরণের পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝতে পারে।'

তার মাঠকর্মীদের রিপোর্ট অনুসারে, মিয়ানমারের বেঙ্গুন থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫৫০টি দ্বীপের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেলেও ৫টি গোত্রের লোকদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় নি।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো। এর মধ্যে আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ৩০,০০০। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় Nicobarese গোষ্ঠী হচ্ছে । যাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। গবেষক রাঘবেন্দ্র রাও এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যৎ দিনগুলোর জন্য একটি ব্যয়সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য হুঁশিয়ারি বা পূর্বাভাস পদ্ধতির চাবিকাঠি রয়েছে এই আদিম গোত্রেরই হাতে।

সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তের সমুদ্রগর্ভে সংঘটিত ভয়ংকর ভূমিকম্পের ফলেই এই সুনামির সূত্রপাত ঘটে। এই সুনামির কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে অসংখ্য মানুষ। বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হাওয়াই-এর হনলুলু দ্বীপে অবস্থিত উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার-এর ন্যায় উন্নত ও নির্ভরযোগ্য হুঁশিয়ারি কেন্দ্রের অভাবেই এত বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তবে ভারতের শীর্ষ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ, যেখানে সুনামির মতো মহাদুর্যোগ অত্যন্ত বিরল, সেখানে এ ধরনের পূর্বাভাস পদ্ধতি বাস্তবসম্মত নয়।

ভারতের প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী এস জেড কাশেম বলেন, 'ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সুনামি পূর্বাভাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা একটা বিশাল কাজ। বিশেষ করে শত শত মাইলব্যাপী সমুদ্র তীরে ২৫ ফুট উঁচু তরঙ্গের মোকাবিলায় পর্যাপ্ত আশ্রয়ণ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

রাঘবেন্দ্র বলেন,'পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পরপরই আমরা এসব দ্বীপের আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বিশাল ও মূল্যবান, স্বদেশজাত, অস্পর্শনীয় জ্ঞান ও টিকে থাকার কৌশল দলিল আকারে সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। কেবলমাত্র আসন্ন বিপর্যয় রোধেই নয়, বরং ভেষজ ও ওষুধি গাছপালা সম্পর্কিত জ্ঞানও আহরণ করা হবে। এসব জ্ঞান দ্রুত নথিভুক্ত করা আবশ্যক। কারণ এসব গোষ্ঠী বিপর্যয়কালীন ভূকাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে কীভাবে শিকার ও অন্যান্যভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে টিকে রয়েছে সেসব তথ্য আমাদের জানা দরকার।'

এসব জনগোষ্ঠী মেসোলিথিক (Mesolithic) এবং আপার প্যালিওলিথিক (Upper paleolithic) আদি অধিবাসীদের বংশধর। এই জমানা ২০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বছর পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছে। হায়দারাবাদ ভিত্তিক 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি' (Centre for Cellular and Molecular Biology)-এর উদ্যোগে এই গোষ্ঠীর অসাধারণ জিনগত (Genetic) বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।

এদের উপর পরিচালিত DNA সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণাংশের Dugong Creek-এ বসবাসকারী Onge-রাই হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা এবং এরা আফ্রিকার পিগমিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এজন্যই এরা আজ সবচেয়ে অধিক বিপন্ন। এদের বর্তমান সংখ্যা ১০০ জনেরও কম। ১৮৮৬ সাল থেকেই বাইরের দুনিয়ার মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে হেপাটাইটিস-বি-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে এদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

গ্রেট আন্দামান দ্বীপের আরেকটি আদিম গোষ্ঠী হচ্ছে জারওয়া। এরা যে কেবলমাত্র বহিরাগতদের দ্বারা রোগাক্রান্ত হয়েছে তা-ই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এ দ্বীপে অবস্থানকারী ব্রিটিশ ও জাপানি সেনারাও তাদের উপর শাস্তি মূলক পরীক্ষা কার্য চালায়।

গ্রেট আন্দামান দ্বীপে পোর্ট ব্লেয়ার ও ডিগ্লিপুরের মধ্যে সড়ক নির্মাণকালেই এখানকার জারওয়া গোত্র অধিক হারে বহিরাগতদের সংস্পর্শে আসে। এসব বহিরাগত লোক মূলত নির্মাণ কাজের জন্য এ দ্বীপে এলেও অনেকেই বসবাসের জন্য থেকে যায়।

Onges জনগোষ্ঠীরই একটা অংশ মনে করা হয় Sentinalese-দেরকে। এরা দক্ষিণ আন্দামানের North Sentinel দ্বীপের বাসিন্দা। এরা সম্ভবত বিশ্বের সর্বশেষ Paleolithic জনগোষ্ঠী। দ্বীপটি এতটাই বিচ্ছিন্ন যে, বহিরাগতদের মধ্যে কেউই এখানে আসার আগ্রহ দেখায় না।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, Sentinalese গোত্র অতিমাত্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এরা জৈব চিকিৎসাগতভাবে (Bio-medically) মূল্যবান। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, তাদের মূল্যবান জিনগত (Genetic) অবকাঠামো বা ধরণ-ধারণের কারণে তারা আধুনিক বিশ্বের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। কারণ অন্যান্য আদিম গোত্র থেকে এ ধরনের জিনগত (Genetic) বৈশিষ্ট্য অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।

বিচ্ছিন্ন এই সেন্টিনেল দ্বীপে ভারতীয় নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো খুব নিচু দিয়ে উড়ে গিয়ে সুনামির পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে। হেলিকপ্টার আরোহীদেরকে এসব আদিম লোকেরা তীর-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এ থোক বোঝা যায়, এ দ্বীপের লোকেরা সুনামির কারণে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

নৌবাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল ভাইস অ্যাডমিরাল এ কে সিং বলেন, তিনি দ্বীপবাসীদের এই শত্রুতা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। কারণ বিষয়টা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, দ্বীপবাসীরা নিরাপদে আছে এবং সুনামির পরে বাইরের কোনও সাহায্য নিতে এরা আগ্রহী নয়। তিনি তীর নিক্ষেপরত Sentinalese-দের ছবিও সাংবাদিকদের প্রদর্শন করেন।

চারটি Negrito গোষ্ঠী ছাড়াও এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে Mongolois গোত্রের কিছু লোক। একটি গোত্রের নাম হচ্ছে Shompens, যাদের সংখ্যা তিনশতের মতো। এছাড়াও রয়েছে Nicobarese যারা সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে।

সুনামির কারণে বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয় Nicobarese গণ। ২০,০০০ জনসংখ্যার এই গোত্রের এক-চতুর্থাংশ সম্ভবত সুনামির ধ্বংসাত্মক তরঙ্গাঘাতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২৬ ডিসেম্বরের সুনামির পরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোকে Port Blair-এর বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেয় নি। তাদের বক্তব্য, আদিবাসীরা বহিরাগতদের আনাগোনায় বিব্রত হোক, এটা তাদের কাম্য নয়।

আদিবাসীদের সুরক্ষা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এজন্যই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ দরকার। আন্দামান ও নিকোবর—উভয় দ্বীপাঞ্চলেই ভারতীয় সামরিক স্থাপনা রয়েছে। একক কম্যান্ডারের অধীনে এখানে রয়েছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

লেখক Ranjit Devraj ইন্টারপ্রেস সার্ভিস-এর একজন সংবাদদাতা।
Third World Network Features, January 2005

মাসিক গণস্বাস্থ্য– বাংলাদেশ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫

উমা

গ্রন্থ সমালোচনা

উদ্বাস্তু মুক্তি ও যুব সমাজ: অসিতবরণ ঠাকুর

প্রকাশক —মুক্ত সমাজ প্রকাশনী, কলকাতা। প্রকাশকাল - ২০১০, পৃষ্ঠাসংখ্যা-১৯১, মূল্য- ১০০ টাকা

মানুষ কত ভাবেই না উদ্বাস্তু হয়! কখনও দেশ ভাগ, কখনও ধর্ম বা জাতিদাঙ্গা, কখনও বা তথাকথিত উন্নয়ন—উদ্বাস্তু হবার হাজার কারণ। তবে রাষ্ট্র ও দেশভাগ জনিত কারণে পাইকারি হারে উদ্বাস্তু হবার ঘটনা ভারতভাগের আগে আর কখনও হয় নি এবং বাঙ্গালীর মতো এত দুঃখ বরণ, কষ্ট, নির্যাতন ও অসম্মানের মুখোমুখি হওয়া বোধহয় অঅর কোনও জাতিকে এমনভাবে পীড়িত করে নি। সেই রাজনৈতিক হীনমন্যতা এখনও চলছে—তার সাম্প্রতিক উদাহরণ দণ্ডকারণ্যে স্থিতু বাঙালী উদ্বাস্তুদের নিয়ে মরিচঝাঁপিতে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের পৈশাচিক খেলা। অসিতবরণ ঠাকুর সেই তামসিক পরিচ্ছদকে আবার পাদপ্রদীপের আলোকে এনে সবার ধন্যবাদার্হ হবেন। পুস্তিকাটির বেশিরভাগ প্রবন্ধই সংকলিত এবং ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। এর প্রথম অংশে উদ্বাস্তু বিষয়ে এবং পরবর্তী অংশে 'মুক্ত সমাজ' নামের ধারণা ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি ইস্তাহারধর্মী লেখাও এতে সংকলিত হয়েছে। মরিচঝাঁপি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও এত পাঁচমিশালি প্রবন্ধের হাটে পুস্তিকাটি তার মূল আবেদন অনেকটাই হারায়। মুদ্রণ সুচারু, মুদ্রণ প্রমাদ প্রায় নেই। প্রচারধর্মী ও কিছুটা একপেশে হলেও মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত প্রবন্ধের কারণে পুস্তিকাটি আদৃত হবে।

পুলক লাহিড়ী